হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি

তথ্য-সংকলন ও গ্রন্থনা
তারাপদ সাঁতরা

সম্পাদনা
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)
বিশেষ আধিকারিক, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার



পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশনা এবং © :
পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রণ, ব্লক ও বাঁধাই :
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মানচিত্র :
শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত
ও
পূর্ত (সড়ক) বিভাগ :
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৮৩ : আগস্ট, ১৯৭৬

প্রথম মুদ্রণ :
২,২০০ কপি

মূল্য : ৬·৫০ টাকা

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ এ রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং কলকাতার যাবতীয় পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর বিশদ বিবরণ সংবলিত ষোলটি গ্রন্থ প্রণয়নের যে প্রকল্প গ্রহণ করেছেন, এ বইটি সে সিরিজের পঞ্চম পুস্তক। বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার ও নদীয়া জেলা সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' অদ্যাবধি প্রায় ৭,০০০ কপি বিক্রীত হয়েছে। অল্প দিনের ব্যবধানে 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি'রও দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, বর্তমান পুস্তকটিও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

সরল ভাষায় লেখা, বহু আলোকচিত্রশোভিত, স্বল্পমূল্যের এই গ্রন্থমালা প্রতিটি বাঙালীকে তাঁর সুমহান পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে শুধু বিশদভাবে অবহিতই করবে না, উত্তরকালের গবেষকদের জন্যও পথ প্রস্তুত করে রাখবে। এ সিরিজের প্রথম গ্রন্থের ভূমিকায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—"এই সুলভ গ্রন্থরাজি ···সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি বিষয়ক এক আকর-গ্রন্থের (Archaeological Encyclopaedia of West Bengal) অভাব পূরণ করিবে।" পুরাতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে আমি, এই গ্রন্থমালার কৃতবিদ্য ও যশস্বী সম্পাদকমণ্ডলী এবং সরেজমিন অনুসন্ধানে কঠোর পরিশ্রমী তথ্যসংকলকগণ, শ্রদ্ধেয় ইতিহাস-তপস্বীর সে শুভ অভিলাষ পূরণে প্রতিশ্রুত। আশা করি, এই সাংস্কৃতিক প্রয়াস বাঙালীমাত্রেরই অকুণ্ঠ অভিনন্দনে ধন্য হবে।

বর্তমান গ্রন্থটি সম্পর্কে পাঠকের মতামত সরকার সাগ্রহে বিবেচনা করবেন। এই মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রয়োজনবোধে, আগামী সংস্করণসমূহ পরিবর্ধিত বা সংশোধিত করা হবে। প্রসঙ্গত জানাই যে, ষোলটি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হবার পর সেগুলি একত্রিত করে একটি সংকলনগ্রন্থ এবং এই সিরিজের পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার ইংরাজী ভাষানুবাদ সরকারী তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
ভাদ্র, ১৩৮৩ : আগস্ট, ১৯৭৬

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

আমার নির্ধারিত কার্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ায়, আমি আজ বর্তমান গ্রন্থমালার প্রকাশন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব আমার স্থলাভিষিক্তের হাতে অর্পণ করেছি। সন্দেহ নেই, এই সিরিজের অবশিষ্ট পুস্তকগুলি যোগ্যতর তত্ত্বাবধানে সুপ্রণীত হবে।

অত্যল্প সময়সীমার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করবার সরকারী স্বার্থেই, অধুনা শান্তিনিকেতনপ্রবাসী অপর সম্পাদক ডঃ সুধীররঞ্জন দাশকে আমি পাণ্ডুলিপির 'ভূমিকা' পরিচ্ছেদটি প্রথানুযায়ী দেখাবার অবকাশ পাইনি। অনন্যোপায় হলেও এজন্য আমি দুঃখিত।

বিশদ পরিমার্জনা ছাড়াও পাণ্ডুলিপিতে বহু নতুন তথ্য সংযোজন করতে হয়েছে। আলোকচিত্রগুলি আমার 'ডার্ক-রুমে' পরিস্ফুটিত ও আমার পরিকল্পিত বিন্যাসপ্রণালী অনুযায়ী মুদ্রিত। 'চলন্তিকা'-অনুসারী মুদ্রণ-সংশোধনের ক্ষেত্রেও নিন্দা-প্রশংসার ভাগী একমাত্র আমি।

এ গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'টির জন্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়কে সকলেই সাধুবাদ দেবেন। পাণ্ডুলিপিতে সরজমিন অনুসন্ধানভিত্তিক প্রচুর তথ্য পরিবেশন ছাড়াও 'অনুক্রমণিকা'টির জন্য শ্রীতারাপদ সাঁতরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। 'বেলুড় মঠ' নিবন্ধটি রচনায় সাহায্যের জন্য আমি ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষের কাছে ঋণী। শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত-কৃত মানচিত্রটি তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। শ্রীসরস্বতী প্রেসের শ্রীমিহির মজুমদার ও তাঁর সুদক্ষ সহকর্মীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া গ্রন্থটি অতিশয় দ্রুততার সঙ্গে এত শোভনভাবে মুদ্রিত হতে পারত না। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
১৭ বৈশাখ, ১৩৮৩ : ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৬

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশেষ আধিকারিক
পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রন্থকারের নিবেদন

হাওড়া জেলায় পুরাকীর্তি-নিদর্শন বিশেষ কিছু নেই এমনই অনেকের ধারণা। আশা করি, বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত ১৪০টি পুরাকীর্তি-স্থলের বিশদ বিবরণ তাঁদের সে ভ্রান্তি দূর করবে। তবু, তন্ন তন্ন সরজমিন অনুসন্ধান সত্ত্বেও দু'একটি উল্লেখ্য স্থান বাদ গিয়ে থাকতে পারে। ভবিষ্যতে সন্ধান পেলে, তাদের বৃত্তান্তও এ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

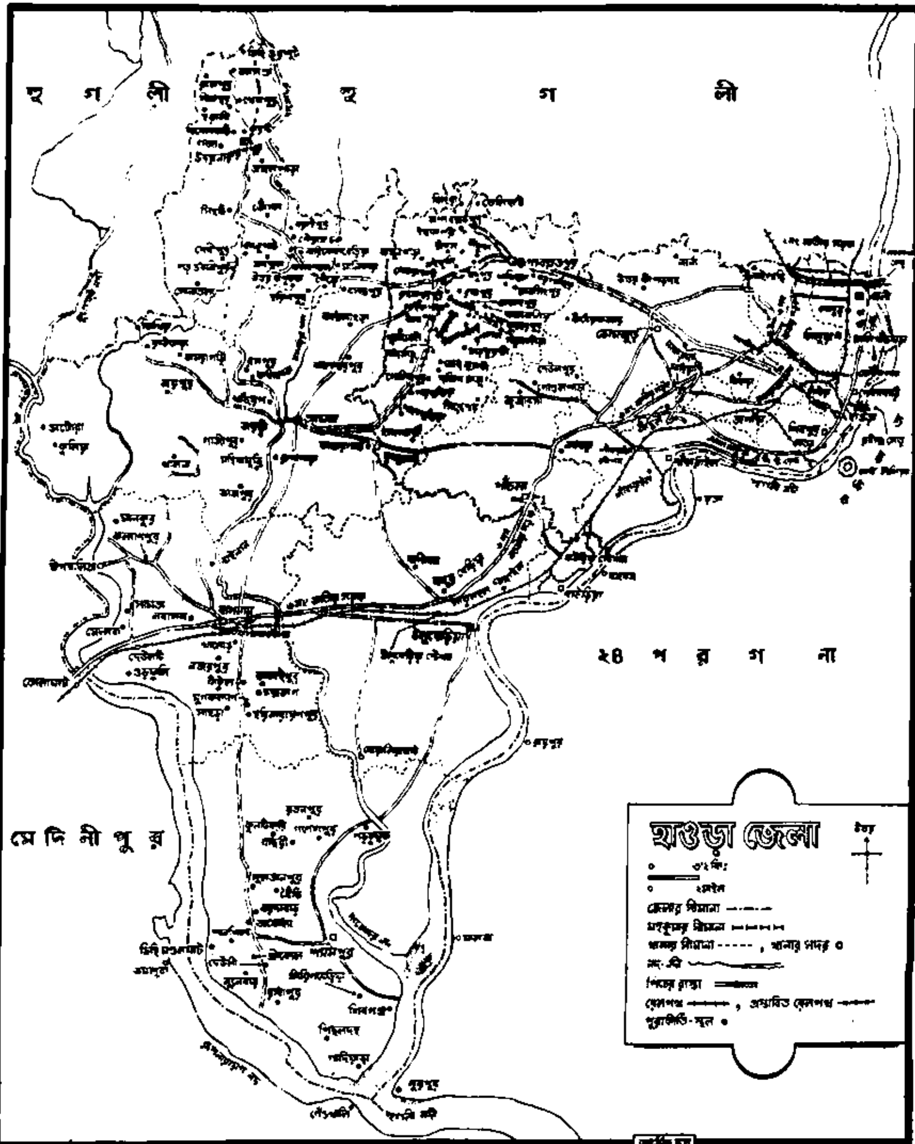
এ গ্রন্থ রচনায় স্বর্গত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এবং ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের জ্ঞানদ সাহচর্য আমাকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের ঋণ প্রথমেই স্মরণ করি। সম্প্রতি লোকান্তরিত আর এক সহাধ্যায়ী বারীন মৈত্রের সহযোগিতার জন্য বিষণ্ণ হৃদয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

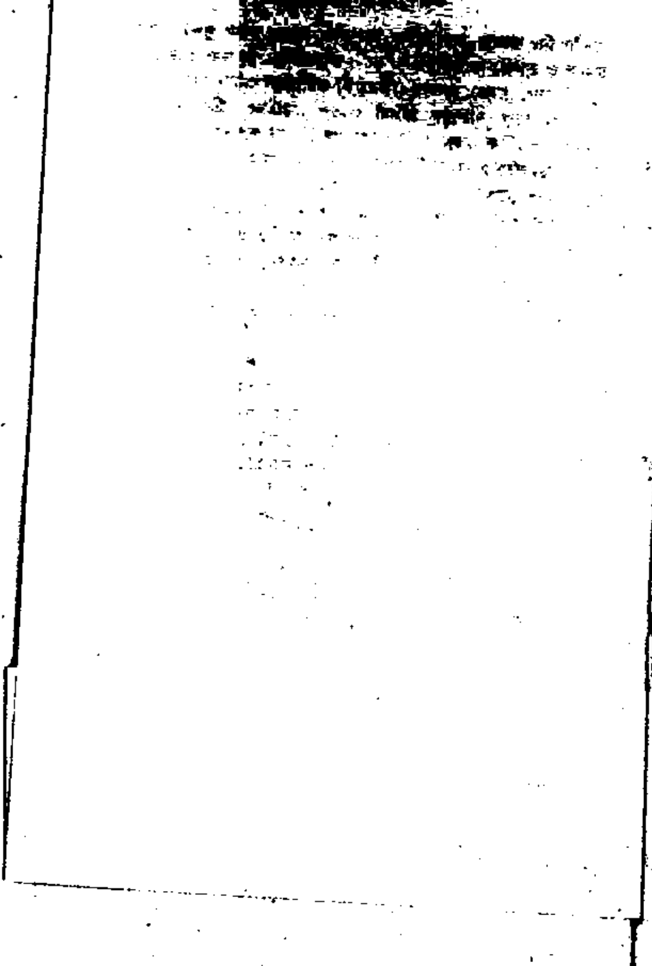
জেলার কয়েকটি অজ্ঞাত প্রত্নস্থলের তথ্য ও আলোকচিত্র সরবরাহ করবার এবং দীর্ঘদিন ক্লেশকর গ্রামপরিক্রমাকালে বিশ্বস্ত সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুজপ্রতিম শ্রীশিবেন্দু মান্নার কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। হাওড়ার প্রাক্তন জেলাশাসক শ্রীপার্থসারথি চৌধুরী নানাভাবে সাহায্য করায় তাঁর কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তা ছাড়া, তথ্যাদি সংগ্রহে সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল রায়, নির্মলেন্দু মান্না, আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঁশরীমোহন ভৌমিক, মানবমোহন মিশ্র, শ্রীধর মাইতি, বাদলচন্দ্র বিশ্বাস, আদিনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গৌরমোহন মাজী, অলককুমার মুখোপাধ্যায়, অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র ছাউলে, অসিতকুমার সামুই, শিশুতোষ ধাওয়া, উমাকান্ত রায়চৌধুরী, অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহৃদয় সহায়তায় আমি কৃতার্থ।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটির আদ্যন্ত পরিমার্জন ও নানাবিধ তথ্যসংযোজন ছাড়াও তাঁর বিশাল সংগ্রহ থেকে ২৭টি উৎকৃষ্ট আলোকচিত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা করে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নানাবিধ সাহায্যের জন্য শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নীলা সাঁতরাকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদজ্ঞাপন বাহুল্যমাত্র।

গ্রাম—নবাসন : ডাকঘর—বাগনান : হাওড়া তারাপদ সাঁতরা
বৈশাখ, ১৩৮৩ : এপ্রিল, ১৯৭৬

সূচীপত্র


হুগলী
হুগলী
২৪ পরগনা
মেদিনীপুর
হাওড়া জেলা
উত্তর
জেলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা, থানার সদর
নদ-নদী
পিচের রাস্তা
রেলপথ, প্রস্তাবিত রেলপথ
পুরাকীর্তি-স্থল



ভূমিকা

ভৌগোলিক রূপরেখা : হাওড়া আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট জেলা। এর উত্তরে হুগলী জেলার আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমা, দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা, পুবে কলকাতাসহ ২৪-পরগনা জেলার বারাকপুর, আলিপুর, ও ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমা এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও তমলুক মহকুমার ও হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার কিছু অংশ। জেলাটি ২২°১২'৩০" থেকে ২২°৪৬' ৫৫" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°২২' ১০" থেকে ৮৭°৫০' ৪৫" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সদর ও উলুবেড়িয়া এই দুই মহকুমায় বিভক্ত এ জেলাকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান বিভাগ থেকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভাগীরথী, রূপনারায়ণ, সরস্বতী, দামোদর, কানা দামোদর বা কৌশিকীর পলিমাটিতে এ জেলা গঠিত। পুবে ভাগীরথী এবং পশ্চিমে রূপনারায়ণের প্রবাহ এ জেলাকে ত্রিভুজের আকার দান করে, মেদিনীপুরের গেঁওখালি বা ২৪-পরগনার নূরপুরের কাছে একত্র মিলিত হয়ে সাগরসঙ্গমের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর-দক্ষিণপ্রবাহী দামোদর নদও জেলার দক্ষিণ প্রান্তে এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে।

জেলার নদনদীগুলির ঘন ঘন গতিপথ পরিবর্তনে তীরবর্তী গ্রাম্য সমাজের বিকাশ ও বিলোপ দুই-ই ঘটেছে একসঙ্গে। দামোদর তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাসহ প্রবাহ পরিবর্তন করেছে সবচেয়ে বেশী। কানা নদী, কানা দামোদর বা কৌশিকী, মাদারিয়া খাল, রাজাপুর-সিজবেড়িয়া খাল, বাঁশপাতি খাল প্রভৃতি দামোদরের পরিত্যক্ত খাত-মাত্র। অধুনা প্রায়-লুপ্ত সরস্বতীর ইতিহাসও অনুরূপ। রূপনারায়ণের দু কূল ভাঙ্গাগড়ায় হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার সীমানার পরিবর্তনও ঘটেছে বহুবার।

এ জেলার নামের উৎপত্তি নিয়ে নানান মতামত প্রচলিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, খানাখন্দ ও জলাভূমি অঞ্চল (পূর্ববঙ্গে যা 'হাওড়' নামে পরিচিত) থেকেই 'হাওড়া' নামের উৎপত্তি। জে. ব্যানার্জি রচিত 'হাওড়া সিভিক কম্প্যানিয়ন' গ্রন্থের মতে, ওড়িয়া ভাষায় 'হাবোড়' শব্দের অর্থ—জলা। যেহেতু

এ জেলার কিছু অংশ একদা ওড়িশার অধীন ছিল, সেজন্য ওই ওড়িয়া শব্দটি থেকে হাওড়া নামের উৎপত্তি। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও অমিয় কুমার ব্যানার্জি কর্তৃক সম্পাদিত (ইংরেজী) হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকে দিল্লীর বাদশাহ্ ফারুকশায়রের সিংহাসনপ্রাপ্তি উপলক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল কাউন্সিল তাঁদের প্রেরিত প্রতিনিধি মারফৎ কলকাতার অপর তীরে যেসব মৌজার পত্তনী প্রার্থনা করেন তা হল—শালিকা, হাড়িয়াড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর এবং বেতড়। হাড়িয়াড়া ছাড়া অন্য মৌজা-নামগুলি এখনও প্রচলিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন হাড়িয়াড়া মৌজায় আজকের হাওড়া রেল-স্টেশনের পত্তন করেন, তখন থেকেই সে মৌজার নাম লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে হাওড়ায় পরিণত হয় এবং সর্ববৃহৎ বা সদর শহরের নাম, অনুরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তের মত, জেলার ক্ষেত্রেও আরোপিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে 'আড়া'-অন্ত বহু গ্রাম-নামের দেখা মেলে। 'আড়া' অর্থে বাসস্থান। যথা, পাল পদবীধারীরা যে 'আড়া' বা ডাঙ্গা বা বাঁধের পাড়ে বাস করেন, সে গ্রামের নাম হয়েছে পালোড়া। অনুরূপভাবে, সম্ভবতঃ হাঁড়ী পদবীধারী বা হাড়ি সম্প্রদায়ের বসতির থেকে 'হাড়িআড়া' পল্লীর নাম কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে 'হাওড়ায়'।

প্রশাসনিক কারণে, হাওড়া জেলার সীমানা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ইংরেজ আধিপত্যের শুরুতে, বর্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলার মোট এলাকা যুক্তভাবে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, বর্ধমান জেলা থেকে পৃথক করে, হাওড়া ও হুগলী জেলার মিলিত অংশ নিয়ে হুগলী জেলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু হুগলী ও বর্ধমানের কালেক্টোরেট তখনও বর্ধমানেই থাকে। আজকের হাওড়া জেলার বাগনান ও আমতা থানা সে সময় ছিল হুগলীর অন্তর্গত এবং হাওড়া শহর রাজধানী কলকাতার অংশ বলে গণ্য হওয়ায় সেখানকার যাবতীয় ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন ২৪-পরগনার জেলাশাসক ও জেলা-জজ্। তখনকার ২৪-পরগনার রাজাপুর থানা (বর্তমানে হাওড়ার ডোমজুড় থানা) এবং কোটরা থানা (বর্তমান হাওড়ার শ্যামপুর থানা) ও উলুবেড়িয়া থানা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪-পরগনা থেকে হুগলী জেলার অধীন করা হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হুগলী ও হাওড়া কালেক্টোরেটকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দেওয়া হয় বর্ধমান কালেক্টোরেট থেকে। হাওড়া শহরের ক্রমোন্নতির জন্য, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার

জন্য স্বতন্ত্র একজন জেলাশাসক নিযুক্ত হওয়ায়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হুগলীর জেলাশাসকের অধিকারের অবসান ঘটে। হাওড়ার প্রথম জেলাশাসক, উইলিয়ম টেলর-এর এক্তিয়ারের সীমা নির্দিষ্ট হয়—হাওড়া, শালকিয়া, আমতা, রাজাপুর (বর্তমানের ডোমজুড়), উলুবেড়িয়া, কোটরা (বর্তমানের শ্যামপুর) ও বাগনান থানাসমূহের মোট এলাকা। এই সময় থেকেই হাওড়া জেলা মোটামুটিভাবে তার বর্তমান রূপপরিগ্রহ করে। পরবর্তীকালে সীমানার আর কিছু অদলবদলের পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি থেকে হাওড়া জেলা চূড়ান্তভাবে তার বর্তমান রূপ নেয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ: আজকের হাওড়া জেলার কোন ভূভাগ বা জনপদের উল্লেখ প্রাচীন জৈন, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক গ্রন্থে না পাওয়া গেলেও, পরবর্তীকালের কোন কোন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থে, তাম্রশাসনে বা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণে সে রকম উল্লেখ কিছু কিছু পাওয়া যায়। এ জেলার বাগনান-নবাসনে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ও লোকশিল্পের গ্রামীণ প্রদর্শপ্রতিষ্ঠান 'আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা'র পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয়েছে (এ ছাড়া, সরকারী পর্যায়ে, অদ্যাবধি কিছু করা হয়নি) তা খুবই সীমাবদ্ধ। এরূপ একটি ছোট সংস্থার পক্ষে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি নিয়ে যথাযথ গবেষণা, শ্রেণীবিভাগ ও কালনির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তা হলেও সেসব নিদর্শনের আকার-প্রকারের সঙ্গে অন্যান্য প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর সাদৃশ্যগত মিল থাকায়, এ জেলার পুরাতাত্ত্বিক অতীত সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুমানভিত্তিক একটা ধারণা হয়ত গড়ে তুলতে পারা যায়।

উল্লিখিত পুরানিদর্শনের মধ্যে কালচে-সবুজ রঙের পাথরের একটি তিনকোণা নবাশ্মর আয়ুধ এবং বর্শার ফলার আকারে ব্যবহৃত হাড়ের দু একটি পুরাবস্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদা রূপনারায়ণতীরবর্তী বর্তমান হরিনারায়ণপুর গ্রাম (থানা বাগনান) থেকে আবিষ্কৃত এসব অভিজ্ঞানকে নব্যপ্রস্তর-যুগের আদিম অধিবাসীদের পরিত্যক্ত অস্ত্র বলেই বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। (দ্রষ্টব্য: (1) Occurrence of Neolithic Implements in West Bengal : Bulletin of the Cultural Research Institute, 1967, Vol.-I, pp.110-14 এবং (2) The State Archaeological Gallery of West Bengal, Calcutta Review, 1971, No. 1 & 2, p. 119)।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে কিন্তু বলা হয়েছে, এই জেলার মাটির নীচে সুঁদরী গাছ (স্থানীয় কথ্যভাষায় 'খাড় কাঠ') ও সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ ছাড়া আর কোন উপাদানই পাওয়া যায়নি। অথচ সম্প্রতিকালে নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন নদনদীর অববাহিকা অঞ্চলে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে আদিম যুগের বহু প্রত্নাশ্মর ও নবাশ্মর আয়ুধ এবং আদিম প্রভাবযুক্ত মৃত্তিকা ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত একই অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। পলিমাটিগঠিত মেদিনীপুর জেলার তমলুক এলাকা থেকে যেসব নবাশ্মর আয়ুধ প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির স্তরভিত্তিক কালনির্ণয় করে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সেগুলিকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকের পূর্বের নব্যপ্রস্তরযুগের সংস্কৃতিজাত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এগুলির সঙ্গে হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত আয়ুধের সাদৃশ্য থাকায়, সেটিকে এ জেলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক নিদর্শন মনে করা যায়। হাওড়া জেলার অন্ততঃ দক্ষিণাংশ যে একদা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত-সভ্যতার প্রভাবাধীন ছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তমলুকের অনতিদূরে, হাওড়া জেলার বাছরী গ্রামের (থানা—শ্যামপুর) 'দমদমা' (ঢিপি) এবং হরিনারায়ণপুর গ্রামের (থানা—বাগনান) 'দমদমা' থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক এবং খেলনা-পুতুলের সঙ্গে তমলুক এলাকায় আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দেখা যায়, তাও উল্লিখিত প্রভাব-পরিমণ্ডলের স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ।

তমলুকের পুরাবস্তুগুলির নজিরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন, সমকালীন গ্রীস ও রোমের সঙ্গে সমুদ্রপথে সে অঞ্চলের এক বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। টলেমী, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত তাঁর ভৌগোলিক বিবরণে, 'পালিবোথরা' বা পাটলিপুত্রের পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে 'কমবাইসন' নদীতীরে 'তমালিটিস' নামে এক নগরীর উল্লেখ করেছেন। স্পষ্টতঃই, সে জনপদ প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা আজকের তমলুক। এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা-কেন্দ্রের অদূরে, রূপনারায়ণ নদের অপর তীরে, হাওড়া জেলার রাধাপুর গ্রামে (থানা—শ্যামপুর) রোমান শিরস্ত্রাণ পরিহিত, দ্বিমুখবিশিষ্ট, হাতলযুক্ত, পোড়ামাটির এক অদ্ভুত মূর্তি (বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত) সম্পর্কে পণ্ডিতদের

মত—সেটি প্রাচীন রোমক যুদ্ধদেবতা 'জানুস'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অতএব, এ জেলার দক্ষিণাংশের বহুস্থান যে তাম্রলিপ্ত-সভ্যতার সহযাত্রী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অদ্যাবধি সংগৃহীত বিবিধ প্রমাণের ভিত্তিতে বোঝা যায়, আজকের হাওড়া জেলার ভূভাগ প্রাচীনকালের 'লাঢ়' (রাঢ়), সুহ্ম বা তাম্রলিপ্তি জনপদবিভাগের অন্তর্গত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্তে' তীর্থংকর মহাবীরের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'লাঢ়' দেশের 'বজ্জ' ও 'সুব্ব'ভূমিতে পরিভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'আচারাঙ্গ সূত্তে'র 'লাঢ়' যে প্রাচীন বঙ্গের রাঢ় অঞ্চল তাতে সন্দেহ নেই। সেকালের পশ্চিমবঙ্গ এলাকার জঙ্গলাকীর্ণ, কঙ্করময় প্রদেশকে পণ্ডিতেরা 'বজ্জভূমি' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 'সুব্ব'ভূমির নাম শুধু 'আচারাঙ্গ সূত্তে'ই উল্লিখিত হয়নি, জৈন ধর্মগ্রন্থ 'কল্পসূত্র' ও 'ভগবতী সূত্র'তেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বৌদ্ধ জাতকের গল্পে 'সুহ্ম'-এর অন্তর্গত 'দেশক' নামে যে নগরের কথা আছে, তা পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'সংযুক্ত নিকায়'তেও 'সেতক' বা 'সেধক' নামে উল্লিখিত হয়েছে। জৈনদের 'সুব্ব'ভূমি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে বর্ণিত সুহ্মকেই সনাক্ত করে। গুপ্তযুগে, বর্তমান আকারে সংকলিত কর্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গেও সুহ্ম অঞ্চলের উল্লেখ আছে। মগধের পূর্বে, নেপালের দক্ষিণে, লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে এবং সমুদ্রতীরে জনবসতির নাম সুহ্ম বলে বর্ণিত হয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা পাণ্ডববীর ভীমের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে সুহ্মবাসীদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। বরাহমিহির রচিত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের 'বৃহৎসংহিতা'য় সুহ্ম এক পশ্চিমপ্রত্যন্তপ্রদেশরূপে উল্লিখিত, যা সমকালীন 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এও সমর্থিত। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর খ্রীষ্টীয় বারো শতকের রচনা 'পবনদূতম'-এ গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে সুহ্মের অবস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বেশ কিছু এলাকা এবং হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম, যা পরবর্তীকালে মোটামুটিভাবে দক্ষিণ রাঢ় নামে চিহ্নিত হয়েছে। সম্ভবতঃ, সুহ্ম-সভ্যতার প্রভাবসীমা একদা সমগ্র রাঢ়েই বিস্তৃতিলাভ করেছিল।

অন্যদিকে, জৈন ধর্মগ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপন'-এ বঙ্গের এক বৃহৎ অংশ নিয়ে গঠিত 'তাম্রলিপ্ত'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় যা, পৌরাণিক বিবরণ অনুসারে, 'তাম্রলিপ্তিক' নামে এক জনগোষ্ঠীঅধ্যুষিত স্বাধীন রাজ্য হিসাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দণ্ডীনরচিত 'দশকুমার চরিত'-এর মতে সুহ্মের প্রভাব দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তিতেও বিস্তৃত হয়েছিল। সুতরাং মনে হয়, সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্ত তার সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে ভিন্ন রাজ্য হলেও তা সুহ্মের দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। আবার, বৃহত্তর রাঢ়াভূমির দক্ষিণবর্তী অংশ ছিল এই সুহ্মভূমি। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, আজকের হাওড়া জেলার এক বৃহৎ অংশ সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল (দ্রষ্টব্য : Some Janapadas of Ancient Rāḍha—Indian Historical Quaterly. voll-viii, 1932, pp. 524-29)। শশিভূষণ চৌধুরীও বলেছেন—প্রাচীনকালে রাঢ়দেশের যে অংশ সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল, তা সম্ভবত: রাঢ়ের দক্ষিণাংশ বর্তমানের হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলাকেই সূচিত করে। (দ্রষ্টব্য : Ethnic Settlements in Ancient India. 1955. pp. 159-61)। খ্রীষ্টীয় এগারো শতকের তিরুমালাই শিলালিপি থেকে জানা যায়, রাজেন্দ্র চোল ওড্ড-বিষয় এবং কোশলৈনাড়ু (দক্ষিণ কোশল) অধিকারের পর ধর্মপালকে পরাজিত করে তণ্ডবুত্তি বা দাণ্ডভুক্তি (বর্তমানের দাঁতন), তক্কন-লাঢ়মের রণশূর (যা সম্ভবত: অপার-মান্দারের বা আজকের হুগলী জেলার গোঘাট থানার গড়মান্দারণের শূর রাজাদের রাজ্য হিসাবে খ্যাত ছিল) এবং বঙ্গ অধিকার করেছিলেন। এ শিলালিপির বর্ণনা থেকে স্পষ্ট ধারণা হয়, দণ্ডভুক্তি ও বঙ্গের মধ্যস্থলবর্তী রাষ্ট্রই ছিল তক্কন-লাঢ়ম বা দক্ষিণ রাঢ়।

দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্মের অন্তর্গত আজকের হাওড়া জেলা এলাকার অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ দিকে রচিত ভট্ট শ্রীধরাচার্যের 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে। সেখানে লেখক তাঁর ভণিতায় (আত্মপরিচয়ে) বলেছেন :

"আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥"

দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠীর এই ব্রাহ্মণসমাজের কৌলীন্য ও বিদ্যার অহংকার এমনই তুঙ্গে পৌঁছেছিল যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের চান্দেলরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণমিশ্র তাঁর বিখ্যাত 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁদেরই আদলে অঙ্কিত করেছিলেন। 'ভূরি সৃষ্টি' বা 'ভূরিশ্রেষ্ঠিক' জনপদই বর্তমান হাওড়া জেলার ভুরশুট গ্রাম

('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদের 'ডিহি-ভুরশুট' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের অধিকাংশ ভূভাগই দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। হরেকৃষ্ণ মহতাবের 'হিস্ট্রি অফ্ ওড়িশা'তে বলা হয়েছে, কেন্দুয়া পাটনা, পাঞ্জাবী মঠ এবং শঙ্করানন্দ মঠে রক্ষিত তাম্রপট্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় বারো শতকের রামপালের পুত্র কুমারপালের দুর্বলতার সুযোগে ওড়িশার অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ রাঢ় আক্রমণ করে গঙ্গাতীরবর্তী মান্দারের রাজাকে পরাস্ত করেন। এই মান্দারই যে আজকের গড়মান্দারণ সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুরাতন হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারের মতে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা-পঞ্জী'র বিবরণ অনুসারে, ওড়িশার পরবর্তী নৃপতি অনঙ্গ ভীমদেব রাঢ়দেশের দামোদরতীর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত করেন। অর্থাৎ, বর্তমান হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার এলাকা পর্যন্ত যে এই বিজয় অভিযান প্রসারিত হয়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। মুসলমান আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চল ওড়িশার অধীনস্থই থাকে।

সেন-রাজবংশের বিজয়সেন একদা হাওড়া এলাকাসহ সমগ্র বাংলায় তার আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে, ব্যারাকপুর তাম্রশাসন অনুসারে, বিজয়সেন অপার-মন্দারের রাজকন্যা বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন। সুতরাং মনে হয়, হুগলী জেলার মান্দারণ এলাকার শূর নৃপতিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায়, অদূরের হাওড়া জেলা অঞ্চলেও বিজয়সেনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। ২৪-পরগনার গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে যে, বর্ধমানভুক্তি গঙ্গা (ভাগীরথী) ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আঞ্চলিক স্তরবিন্যাসে 'বিষয়' 'মণ্ডল' 'খটিক' 'চতুরক' এবং 'গ্রাম'-এ বিভক্ত ছিল। বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত কোন এক বিড্ডারশাসন গ্রাম অবস্থিত ছিল পশ্চিম-খটিকার অংশ বেতড্ড-চতুরকের মধ্যে। বর্ধমানভুক্তি যে সেন-রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূভাগ ছিল তার প্রমাণ মেলে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটি গ্রামে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন থেকে। সেকালের বেতড্ড-চতুরকই যে আজকের বেতড়, সে সম্বন্ধে 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদের 'বেতড়' নিবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সমীক্ষার পরিপূরক হিসাবে এবার প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের বিশ্লেষণে আসা যেতে পারে। এ সম্পর্কে এ জেলার বাছরী,

হরিনারায়ণপুর, রাধাপুর, পিছলদহ, বাঁটুল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মোটামুটি আলোচনা ইতঃপূর্বেই করা হয়েছে। তবু হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত আদিম বঙ্গাক্ষরযুক্ত পোড়ামাটির লিপিফলকগুলি সম্বন্ধে আর কিছু সংযোজন প্রয়োজন। এ জাতীয় প্রাচীন লিপিফলক মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও পান্না এবং মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণতেও পাওয়া গিয়েছে। এসব ফলকের ব্যবহার সম্পর্কে 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' পত্রিকার ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সরকার বিহারের মুঙ্গের জেলায় প্রাপ্ত অনুরূপ একটি পোড়ামাটির ফলকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সে লিপির পাঠোদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন—দেবতার কাছে কোন বস্তু নিবেদনের সময় উৎসর্গকারীর বক্তব্য যেমন তাম্রপট্টে লিখে দেবার রীতি ছিল তেমনই দরিদ্রদের পক্ষে তাম্রপট্ট ব্যয়সাধ্য হওয়ায়, সস্তায় তৈরী পোড়ামাটির এইসব লিপিফলক ব্যবহৃত হত।

এ ছাড়া এ জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত মুনেবাড় গ্রামে পঞ্চানন্দ নামে পূজিত খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি, দেউলীহাটে কাত্যায়নী নামে পূজিত কতকগুলি প্রাচীন মূর্তি এবং কোন বিনষ্ট মন্দিরে ব্যবহৃত দ্বারপার্শ্বের ভগ্নাংশ, বৈঁচি গ্রামে কোন প্রাচীন মন্দিরে দ্বারপাল হিসাবে ব্যবহৃত এবং এখন দক্ষিণরায়জ্ঞানে উপাসিত মূর্তি প্রভৃতিও জেলার প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে।

বাগনান থানা এলাকায় রূপনারায়ণতীরবর্তী কিছু স্থানে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মেল্লক গ্রামের মদনগোপালজীউর মন্দিরে যে দুটি অলংকৃত পাথরের স্তম্ভ চৌকাঠ হিসাবে ব্যবহৃত, তা যে পালযুগের সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। একই দেবালয়ের অলিন্দে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তিটিও নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের। পাশের সামতা পল্লীতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটিও সমকালীন বলে অনুমিত। মানকুর গ্রামে প্রাচীন মৃৎপাত্রসহ যে চামুণ্ডামূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের হওয়া সম্ভব। তখন সেখানে হয়ত শাক্ত উপাসনার কোন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। খালোড় গ্রামের কালীমন্দিরের পাশে ধর্মঠাকুরের থানে অনেকগুলি কূর্মমূর্তির সঙ্গে ধর্মরাজজ্ঞানে উপাসিত পাল-শৈলীর পাথরের একটি ছোট বিষ্ণুমূর্তি, বাইনান গ্রামে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের ভগ্ন সূর্যমূর্তি প্রভৃতিও এ অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বের ইঙ্গিতবাহী।

আমতা থানায় দামোদরতীরবর্তী মেলাইচণ্ডীর মন্দিরে রক্ষিত পাথরের একটি ভাস্কর্যফলক এবং স্থানীয় বাজার এলাকায় পঞ্চানন্দ-স্থানে পূজিত খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের মুণ্ডহীন এক বিষ্ণুমূর্তি, জয়পুর গ্রামের জলেশ্বর শিবমন্দিরে রক্ষিত খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের একটি অভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি এবং কোন প্রাচীন মন্দিরের পাথরের দ্বারপার্শ্ব ও দ্বারশীর্ষ, খড়িয়প গ্রামের গণেশমূর্তিযুক্ত পাথরের দ্বারশীর্ষ এবং রসপুর গ্রামের পড়চণ্ডীর মন্দিরে রক্ষিত ও একান্ত বিরল পাথরের মনসামূর্তিটি (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের) প্রভৃতি এ থানা এলাকার প্রাচীনত্বই সূচিত করে।

এ জেলার প্রাচীন নদ কৌশিকীর (স্থানীয়ভাবে 'কানা নদী' বা 'কানা দামোদর' নামে পরিচিত) তীরেও অতীত সভ্যতার যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে খ্রীষ্টীয় এগারো শতকের একটি বিখ্যদত্তাত্রেয়মূর্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্র-সন্নিবিষ্ট মূর্তি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এর এক কাহিনীতে প্রকাশ, কৌশিক নামে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত জনৈক ব্রাহ্মণ ঋষি অণিমাণ্ডব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হলে তাঁর সাধ্বী পত্নীর চেষ্টায় শাপমুক্ত হন। এ মহানুভবতার জন্য ঋষিপত্নী বরলাভ করেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত হবেন। সুতরাং মূর্তিটি বেশ প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। পুরাণোক্ত কাহিনী থেকে এ নদের 'কৌশিকী' নামকরণও যে বহুদিনের তা প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়া কৌশিকী উপত্যকায় অবস্থিত জগৎবল্লভপুরে বালির খাদ খোঁড়ার সময় যেসব প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি, মৃৎপাত্র এবং আদিম বঙ্গাক্ষরের নমুনাযুক্ত পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে তমলুক, হরিনারায়ণপুর ও বাহুরীতে প্রাপ্ত অনুরূপ নিদর্শনের সাদৃশ্য দেখা যায়। অদূরের তেলিহাটি গ্রামেও বালিখননকালে আবিষ্কৃত ছোট একটি উমালিঙ্গনমূর্তি, উভয় পৃষ্ঠে ভাস্কর্যক্ষোদিত বিষ্ণুপট্ট ও বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ প্রভৃতি পাথরের পুরাবস্তুর গঠনশৈলী খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের বলেই অনুমিত। একই এলাকার চাঁচুল, নিজবালিয়া, চোঙ্-ঘুরালি, মাড়ঘুরালি প্রভৃতি গ্রামে প্রাপ্ত পাল-সেন আমলের পাথরের বিষ্ণুমূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পোলগুস্তিয়ার মগরাইচণ্ডী এবং পারগুস্তিয়ার জলেশ্বর নামে পূজিত প্রস্তরখণ্ডগুলি যে প্রাচীন মন্দিরের অংশ তাতেও সন্দেহ নেই। অতএব, খ্রীষ্টীয় দশম-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কৌশিকী উপত্যকায় অবস্থিত বহু পুরাকীর্তির 'পাথুরে' প্রমাণ বর্তমান।

এ জেলার পূর্বাঞ্চলে, প্রাচীন বেতড়ের কাছে, ভাগীরথীর সঙ্গে একদাযুক্ত সরস্বতীর উপত্যকাতেও পাথরের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। যথা, বাঁকড়া গ্রামের খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের একটি ভগ্ন নবগ্রহ-ভাস্কর্য, বালটিকুরীতে অনুরূপ প্রাচীন এক বিষ্ণুমূর্তি, উত্তর ঝাঁপড়দহের কিছু অর্বাচীন চামুণ্ডামূর্তি প্রভৃতি।

ভাগীরথীতীরবর্তী প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে বালী গ্রামের কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে রক্ষিত খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর দুটি বিষ্ণুমূর্তি, উলুবেড়িয়া থানার মিঠেকুণ্ডু গ্রামে প্রাপ্ত পাথরের মন্দিরের দ্বারশীর্ষে ব্যবহৃত কীর্তিমুখের ভগ্নাংশ এবং যদুরবেড়ে ও সাতমহল গ্রামে আবিষ্কৃত বহু প্রাচীন মন্দিরাংশ প্রভৃতি এ অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বের ইঙ্গিতবাহী।

হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এসব প্রাচীন পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বাসুদেব-বিষ্ণু উপাসনার নজির এ অঞ্চলে এত বেশী যে, সন্দেহ হয় এই ভূভাগ মহাযানী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল-রাজাদের শাসনবহির্ভূত ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত উৎখননের সাক্ষ্যপ্রমাণাভাবে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না।

খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের প্রথমে বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক লক্ষ্মণসেনের রাজধানী অধিকারের সঙ্গে দক্ষিণ রাঢ় মুসলমান অধিকৃত এলাকায় পরিণত হলেও সেখানে নতুন শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় হতে বেশ কিছুকাল সময় লাগে। পনেরো শতকের শেষ দিকে হুসেন শাহের সমগ্র বাংলা-বিহার অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয়নি, কেননা ষোলো শতকের মধ্যভাগে ওড়িশারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দন বাংলা আক্রমণ করে বর্তমান হাওড়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশসহ হুগলীর ত্রিবেণী পর্যন্ত দখল করে নেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান সুলেমান কররানী মুকুন্দদেবকে বিতাড়িত করে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত ওড়িশা-এলাকা অধিকার করেন। সুলেমান কররানীর রাজত্বকালে, রাজস্ব আদায়ের মহল হিসাবে হাওড়া জেলার এক বিস্তৃত অংশসমেত যে নতুন বিভাগ গঠিত হয়, সুলেমান কররানীর নামানুসারে তার নাম হয় সুলিয়ামানাবাদ। সুলেমানের পুত্র দায়ুদ কররানীর মৃত্যুর পর, সমগ্র বঙ্গদেশ কার্যতঃ মোগল বাদশাহ্ আকবরের শাসনে আসে এবং ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তোডরমলের রাজস্ব-এলাকা বিভাগের কালে বর্তমান হাওড়া জেলার সমুদয় অংশ সুবা বাংলার যে তিনটি 'সরকার'-এর মধ্যে বিভক্ত করা হয় তারা হল সাতগাঁ, সুলিয়ামানাবাদ এবং মান্দারণ। সরকার সাতগাঁর অন্তর্ভুক্ত মহলগুলির

নাম পুড়া (পরবর্তীকালের বোরো পরগনা, যার মধ্যে বর্তমান হাওড়া শহরের অবস্থিতি), বালিয়া ও খাড়োর (বর্তমানের খালোড়) পরগনা আর সরকার মুলিয়ামানাবাদের মধ্যে পড়ে বসেন্ধরী, ভোসাট (ভূরশুট) ও ধাড়ঙ্গা পরগনা এবং মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত হয় মণ্ডলঘাট পরগনা।

শেষ-মধ্যযুগে হাওড়া জেলার বিস্তৃত ইতিহাস না জানা গেলেও সেকালের মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য এবং সমকালীন কিছু বিদেশী ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তে ও মানচিত্রে এ জেলার কতকগুলি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর মতে, নীলাচল যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরের কাছে ভাগীরথী পার হয়ে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা ও কুলীন-গ্রাম অতিক্রম করে দামোদর পার হবার আগে হাওড়া-হুগলীর সীমানায় অবস্থিত পিয়াখালায় উপস্থিত হন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'তে বলা হয়েছে, শ্রীচৈতন্যদেব তাম্রলিপ্ত যাবার পথে পিছলদহে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিলেন ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদের 'পিছলদহ' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। খ্রীষ্টীয় পনেরো শতকের শেষভাগে রচিত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল'-এ চাঁদ সদাগরের বর্ধমান থেকে সমুদ্রযাত্রাপথের তীরবর্তী গ্রামগুলির মধ্যে এ জেলার ঘুসুড়ি ও বেতড়ের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এও আমতার মেলাইচণ্ডী ও বালীগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মধ্যভাগে অঙ্কিত ডি-বারোসের মানচিত্রে দামোদর ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী স্থানে প্রদর্শিত 'পিসাকুলি' নামক স্থানটিকে সনাক্ত করা যায়নি। আবার, সতরো শতকের দ্বিতীয় ভাগে প্রস্তুত মানচিত্রে এ স্থান-নামটি উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ডি-বারোস 'পিসলতা' এবং গ্যাস্টলডি 'পিকলদা' নামে যে জায়গার উল্লেখ করেছেন, তা আজকের পিছলদহ বলেই সাব্যস্ত হয়েছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুরাতন হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে সিজার ফ্রেডারিকের এক ভ্রমণবৃত্তান্ত উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সরস্বতী নদীর অগভীরতার জন্য সপ্তগ্রাম বন্দরের সঙ্গে পূর্বতন যোগাযোগরক্ষা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলে ভাগীরথীতীরবর্তী বেতড় বিদেশী বণিকদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। এই কেন্দ্রে যোগান অব্যাহত রাখবার জন্য একদিকে যেমন কৃষিকার্যের প্রসার ঘটে অন্যদিকে তেমনই ভাগীরথীতীরবর্তী হাওড়া ও হুগলী জেলায় তন্তুবায় ও অন্যান্য কুটিরশিল্পীদের কেন্দ্রীভূত বসবাস ত্বরান্বিত হয়। এইভাবে নদী ও সমুদ্রপথে অর্থকরী পণ্যের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায়

জলদস্যুদের আক্রমণ শুরু হয়। এই 'মগ' দস্যুদের প্রতিহত করবার জন্য তৎকালীন মুসলমান শাসকেরা ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বর্তমান মেটিয়াবুরুজের বিপরীত (পশ্চিম) তীরে এক দুর্গ নির্মাণ করেন যা পরিচিত হয় থানা মাকুয়া কেল্লা নামে। এ দুর্গ ও সমকালীন আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরবর্তী পরিচ্ছেদের 'থানা মাকুয়া' নিবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

মোগল রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে এ জেলার ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ইংরেজ বণিকদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয় হুগলীতে। কিন্তু বাংলার তৎকালীন সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে বিরোধের ফলে হুগলী কুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জোব চার্ণক সসৈন্যে ভাগীরথীর পূর্বতীরে সুতানুটিতে এসে আশ্রয় নেন। কিন্তু মোগল সৈন্য-বাহিনী সেখানেও তাঁদের পিছু ধাওয়া করলে, তাঁরা পালিয়ে যান হিজলীর দিকে। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি হিজলীতে শায়েস্তা খাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে এক যুদ্ধের পর ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তাতে ইংরেজরা হিজলী থেকে সরে এসে উলুবেড়িয়াতে জাহাজ সারানোর কারখানা নির্মাণের অনুমতি পেলেও তাদের তানা দুর্গে (থানা মাকুয়াতে) যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই চুক্তি অনুসারে চার্ণক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন উলুবেড়িয়াতে এসে উপস্থিত হন এবং প্রথমেই সুপারিশ করেন যে, উলুবেড়িয়াতেই ইংরেজ-ঘাটি স্থাপিত হোক। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটিকে যোগ্যতর মনে করায় জোব চার্ণক শেষ অবধি ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগষ্ট সদলে সুতানুটিতেই ফিরে আসেন। এই তারিখটিকে কলকাতা মহানগরীর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার দিন বলা যায়। এইভাবে সেকালের ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের রাজধানী হবার সম্ভাবনা থেকে উলুবেড়িয়া অল্পের জন্য ভ্রষ্ট হয়।

এ ঘটনার ছয় বছর পরে, শোভা সিংহের ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহের অবসানে, হাওড়া জেলায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অদূরবর্তী কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি তার উন্নতির সহায়ক হয়ে উঠতে থাকে।

দিল্লীর সমকালীন বাদশাহ্ ফারুকসায়রের কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং বর্তমান হাওড়া শহর এলাকায় পাঁচটি গ্রামের পত্তনীর ঘটনাবলী ইতঃপূর্বেই এ জেলার নামোৎপত্তিসংক্রান্ত আলোচনাকালে বিবৃত হয়েছে। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শীদকুলি খাঁর আমলে এবং ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের আমলে ভূমিরাজস্ববিধি সংশোধন করার ফলে, সমগ্র উলুবেড়িয়া মহকুমা

এবং হাওড়া সদর মহকুমার এক বিরাট অংশ বর্ধমান জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্গী আক্রমণের সময় মীর হাবিব বলে কথিত অনৈক ব্যক্তি মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে থানা মাকুয়া দুর্গ দখল করে। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ব্যাপক লুটপাটের মধ্যে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণকালে থানা মাকুয়া দুর্গ আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নবাবী ফৌজকে পরাস্ত করে ইংরেজরা সে সময় এ দুর্গ দখল করে নেয়। কিন্তু নবাব পক্ষের সামরিক চাপ অব্যাহত থাকায় ব্রিটিশরা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি এ দুর্গ পরিত্যাগ করে। তারপর, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন, পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান শাসনের অবসান হলে শুরু হয় প্রায় দু শ বছরের ইংরেজ শাসন।

হাওড়া জেলার ধর্মীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : এ জেলায় প্রাক্-মুসলিম যুগের মন্দিরাদি অটুট বা ভগ্ন অবস্থায় এখন না থাকলেও পাল-সেন আমলে নির্মিত পাথরের মন্দিরের কিছু কিছু অংশ ও সেসব মন্দিরে পূজিত বিগ্রহ জেলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে। মন্দিরাংশের মধ্যে পাথরের দ্বারপার্শ্ব ও দ্বারশীর্ষ, অঙ্গশিখর, 'রথপগ'যুক্ত দেওয়ালের খণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি দ্বারশীর্ষে গণেশ্র, 'গণ' বা 'প্রমথ'র মূর্তি এবং 'পত্রলতা' ক্ষোদিত দেখা যায়। উলুবেড়িয়ার কাছে ভাগীরথী-তীরবর্তী মিঠেকুণ্ড গ্রামে পাওয়া কোন বিশালায়তন প্রাচীন মন্দিরে ব্যবহৃত দ্বারশীর্ষের মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ এক কীর্তিমুখের ভগ্নাংশ বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে। প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশপথের উপরিভাগে প্রথাগতভাবে নিবদ্ধ কয়েকটি নবগ্রহ-মূর্তিফলকও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী পরিচ্ছেদে খড়িয়প, জয়পুর, দেউলী, পারগুস্তিয়া, পিছলদহ, পোলগুস্তিয়া, বাঁকড়া, বৈঁচি, যদুরবেড়ে, সাতমহল প্রভৃতি নিবন্ধে এজাতীয় পুরাবস্তুর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নদীর গতিপরিবর্তন বা তটক্ষয় এবং সর্বশেষে মুসলমান আক্রমণজনিত ধ্বংসলীলায় প্রধানতঃ নদীতীরবর্তী সেসব প্রাচীন মন্দির বর্তমানে লুপ্ত।

মুসলিম শাসনের প্রথম ভাগে এ জেলায় মন্দিরাদি বিশেষ নির্মিত হয়নি। এই শ্রেণীর পুরাকীর্তির নিদর্শন মেলে খ্রীষ্টীয় সতেরো শতক থেকে। সে শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত যে এগারোটি দেবালয় এখনও বিদ্যমান তার কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নরূপ : আমতার মেলাইচণ্ডী

(১৬৪৯ খ্রীঃ), মেল্লকের মদনগোপালজীউ (১৬৫১ খ্রীঃ), সুলতানপুরের 'খটিয়াল' শিব (১৬৬৫ খ্রীঃ), মহিষামুড়ির ভুবনেশ্বরী (১৬৭৯ খ্রীঃ), খড়িয়পের খড়োশ্বর শিব (১৬৮১ খ্রীঃ), জয়পুরের 'মতি-লাল' ধর্মরাজ (১৬৮৪ খ্রীঃ), গড়ভবানীপুরের মণিনাথ শিব (১৬৮৪ খ্রীঃ), খালনার কৃষ্ণরায়জীউ (১৬৮৫ খ্রীঃ), ঝিখিরার শ্যামসুন্দরজীউ (১৬৯১ খ্রীঃ), কল্যাণচকের রামেশ্বর শিব (১৬৯২ খ্রীঃ), বরুইপুরের রঘুনাথ শিব (১৬৯৪ খ্রীঃ), এবং গাজীপুরের পরিত্যক্ত শিবমন্দির (১৬৯৫ খ্রীঃ)।

হাওড়ার মন্দির-প্রতিষ্ঠাতারা প্রধানতঃ ছিলেন জমির উপসত্বভোগী, জমিদারের কর্মচারী অথবা রেশম, সুতীবস্ত্র, লবণ, দুধ, মাদকদ্রব্য ও গুড় ব্যবসায়ী কিংবা পূজারী, কুলপুরোহিত প্রভৃতি। তাঁদের সীমিত বিত্তের কারণে, এ জেলায় চুনবালির পলস্তারাবৃত মন্দির সংখ্যায় 'টেরাকোটা'-মন্দিরের থেকে অনেক বেশী। এ গ্রন্থে আলোচিত মোট ২৩৪টি মন্দিরের মধ্যে মাত্র ৬৮টি 'টেরাকোটা'-সজ্জিত।

এ জেলার দেবালয়গুলি প্রধানতঃ বাংলা-রীতির 'চালা', 'রত্ন' ও 'দালান' শ্রেণীর হলেও, 'নাগর'-শৈলীর ওড়িশায় বিবর্তিত রূপের সরলীকৃত পদ্ধতিতে কিছু কিছু 'শিখর'-মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল এখানে। মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান সিরিজের প্রথম পুস্তক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'-তে (পৃঃ ১১—২৬)। সেজন্য বর্তমান গ্রন্থের শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিধানের জন্য বিষয়টি এখানে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হবে।

গ্রাম-বাংলার বাঁশ, কাঠ ও খড়ের দোচালা কুঁড়েঘরের আদলে বাঙালী মন্দির-স্থপতিরা প্রথম নির্মাণ করেন দোচালা মন্দির, যা 'এক-বাংলা' নামেও পরিচিত। দুটি দোচালাকে পাশাপাশি স্থাপন করে, শীর্ষে কখনও বা চূড়া সংযোগ করে যে-মন্দির নির্মিত হত তার নাম 'জোড়-বাংলা'। রাউতাড়া গ্রামে (পরবর্তী পরিচ্ছেদে 'রাউতাড়া' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) মানিক পীরের দরগাটি এ জেলায় দোচালা-রীতির একমাত্র ইমারত। 'জোড়বাংলা' মন্দিরের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে—পাঁচলা থানার অন্তর্গত গোপালপাড়া গ্রামে। চারচালা কুঁড়েঘরের নজিরে গঠিত 'চারচালা' মন্দিরও এ জেলায় সংখ্যায় খুবই কম। সুলতানপুরের সতরো শতকের 'খটিয়াল' শিবমন্দির এবং ক্ষিরীশবেড়িয়ার আঠারো শতকের চারচালা মন্দিরটি ছাড়া এ জেলায় অনুরূপ রীতির আরও যে দু একটি মন্দির আছে তা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন নয়। গ্রাম-

বাংলার আটচালা কুঁড়েঘরের আদলে নির্মিত 'আটচালা' মন্দিরের সংখ্যাই এ জেলায় সর্বাধিক। পরবর্তী 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদে মোট যে ২৩৪টি মন্দির বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে ১৮৫টিই এই রীতির। সেগুলির মধ্যে আবার ত্রিখিলান অলিন্দবিহীন, একদুয়ারী 'আটচালা'ই গনতিতে গরিষ্ঠ। গ্রামীণ আটচালা বা চারচালা কুঁড়েঘরের সামনে যেমন তিনচালা একটি বাড়তি বারান্দা থাকে, সেই ধরনে গঠিত দেবালয়ের দৃষ্টান্ত—নিজবালিয়া গ্রামের সিংহবাহিনী, ধসা গ্রামের গোপীনাথজীউ এবং জয়পুর গ্রামের জলেশ্বর শিবমন্দির। 'আটচালা'র শীর্ষে আরও এক প্রস্থ 'চারচালা'র সংযোজনে যে 'বারোচালা'র সৃষ্টি হয় তার উদাহরণ—দেউলপুর গ্রামের ঘোষ পরিবারের এবং রাউতাড়া গ্রামের রায় পরিবারের মন্দির দুটি।

'চালা'-মন্দিরের মত 'রত্ন'-মন্দিরেরও কার্নিস বাঁকানো এবং ছাদ চালু হলেও তার স্থাপত্যরীতিতে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য আছে। ছাদের কেন্দ্রে ছোট একটি চূড়া নির্মাণ করলে হয় 'একরত্ন' এবং সেটিকে ঘিরে ছাদের চার কোণে ক্ষুদ্রতর আর চারটি চূড়া স্থাপন করলে হয় 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। এক্ষেত্রে চূড়া ও 'রত্ন' সমার্থক। এইভাবে মন্দিরতলের সংখ্যা বাড়িয়ে বা প্রতি তলের কোণে কোণে চূড়ার সংখ্যা বর্ধিত করে পঁচিশরত্ন মন্দিরও নির্মিত হতে পারে, যার নিদর্শন হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় এখনও দেখা যায়। হাওড়া জেলায় কিন্তু নবরত্ন মন্দিরই বেশী আদৃত হয়েছে। এখানে নবরত্ন মন্দিরের সংখ্যা চৌদ্দটি ও পঞ্চরত্ন মন্দির মাত্র ছ'টি। পোড়ামাটি বা পঙ্খের অলংকরণযুক্ত রত্ন মন্দিরগুলি আমতা, কল্যাণপুর, কুলিয়া, গজা, গণেশপুর, গোবিন্দপুর, ঝিখিরা, পাতিহাল, যাদববাটি ও সীতাপুর গ্রামে অবস্থিত। স্থাপত্যের দিক থেকে গোবিন্দপুরের মন্দিরটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেটির গর্ভগৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণপথ ছাড়াও পুব ও দক্ষিণে ত্রিখিলান অলিন্দ আছে। বর্তমানে পরিত্যক্ত ও আংশিক ভগ্ন হলেও এত বিশদ স্থাপত্যের দেবালয় এ জেলায় আর নেই।

বাংলা-মন্দিরশৈলীর আর এক রূপ দালান-রীতির মন্দির। সামনে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দাসমেত সমতল ছাদের এ দেবালয়গুলিকে ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচ্চন তাঁর 'লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস্ অভ্ বেঙ্গল' গ্রন্থে 'চাঁদনী' রীতির বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে 'চাঁদনী' কথাটির বদলে 'দালান' কথাটিই যে স্থপতিদের কাছে বহুলপ্রচলিত ছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার ভগলপুর গ্রামের দোতলা দালান-

মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে যেখানে ইমারতটিকে 'দালান' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি': পৃঃ ১০১)। তিনটি ফুলকাটা (পত্রাকৃতি) খিলান-সমন্বিত এসব মন্দিরের সামনের দেওয়ালে বহুক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' বা পঙ্খের সজ্জার প্রয়োগ হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্তের দেখা মেলে খালনায় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্যাণপুর, কানুপাট ও দেবীপুরে। দোতলা দালান-মন্দির এ জেলায় একদা বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। নিদর্শন—কল্যাণচক, গাজীপুর, জয়পুর, জোকা ও রাউতাড়া গ্রামের এজাতীয় দেবালয়গুলি।

বাংলা-রীতির প্রধাগত স্থাপত্যের এসব নিদর্শন ছাড়াও অভিনব গঠনের মন্দিরের দৃষ্টান্তও কিছু মেলে। যেমন, যুগকল্যাণ গ্রামের সিং-এর ডাঙ্গার আটকোণা দেবালয়টি। সেখানে নীচের আটকোণাকৃতি ঢালু চালের উপরে অল্প উচ্চতার আটটি খাড়া দেওয়াল তুলে তারপর আটচালা মন্দিরের মত দ্বিতীয় স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের আটকোণা আর একটি চালা। বালী গ্রামে, বিবেকানন্দ সেতুর উত্তরেও এহেন একটি মন্দির আছে।

উত্তরভারত, বিশেষতঃ ওড়িশা থেকে আহৃত 'নাগর'-শৈলীর বিবর্তিত রূপ-অনুসারী শিখর-দেউল এ জেলার পেঁড়ো, হরিশপুর, চাঁচুল, জয়ন্তী, নারিকেলবেড়িয়া নিজবালিয়া, বরুইপুর, খালনা প্রভৃতি গ্রামে অবস্থিত। হরিশপুরের মন্দিরটি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সেটির প্রবেশপথের উপরে 'টেরাকোটা'-সজ্জার প্রয়োগ অভিনব। পোড়ামাটির অলংকরণ না থাকলেও চাঁচুল গ্রামের শিখর-দেউলটি স্থাপত্যের দিক থেকে এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সেখানে চূড়া-অংশটি খাঁজকাটা যা বীরভূম-বাঁকুড়া জেলার অনুরূপ শিখর-নির্মাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া প্রাক্-মুসলিম যুগের রীতি অনুযায়ী এ মন্দিরটির ছাদ ধাপযুক্ত বা লহরাবিন্যস্ত যা এ জেলার আলোচ্য রীতির অন্য কোন মন্দিরে দেখা যায় না। নারিকেলবেড়িয়া, নিজবালিয়া ও বরুইপুরের শিখর-মন্দির তিনটির গর্ভগৃহ প্রধাগত বর্গক্ষেত্র না হয়ে আটকোণা কিন্তু বাইরের দেওয়াল চতুষ্কোণ। চাঁচুলের ব্যতিক্রমটি ছাড়া এ জেলার যাবতীয় মন্দিরের ছাদ মুসলিমরীতি অনুযায়ী চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। অলিন্দ বা দালানের ছাদও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই উৎস থেকে আহৃত নানাবিধ খিলান দ্বারা রক্ষিত। বলা বাহুল্য, এসব স্থাপত্য-প্রকরণ হাওড়া জেলার

নিজস্ব নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই শেষ-মধ্যযুগে তাদের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে।

এ জেলার মন্দিরের বহিরঙ্গ সজ্জায় বহুলব্যবহৃত পোড়ামাটির অলংকরণের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বাংলা-মন্দিরে 'টেরাকোটা'-সজ্জার উৎপত্তি, বিবর্তন ও অবনতি এবং মন্দির দেওয়ালে তাদের সংস্থাপন-রীতি সম্পর্কে বর্তমান সিরিজের প্রথম পুস্তক 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'তে (পৃঃ ১৭-২৬) গ্রন্থকার অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বলে এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেখানে প্রকাশিত মতামত ও সিদ্ধান্তগুলি সাধারণভাবে হাওড়া জেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়ায়, উৎসাহী পাঠক সে গ্রন্থটি দেখতে পারেন। এ জেলার পোড়ামাটি-সজ্জার প্রধান বিষয়বস্তু—কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার ও রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্যসহ নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনী। সেকালের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার রূপায়ণ, সমকালীন ফিরিঙ্গী-জীবনচিত্র, ধনী ভূস্বামীদের বিলাসবহুল জীবনের ভাস্কর্য, মিথুনদৃশ্য, ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশাও পোড়ামাটির ফলকে স্থান পেয়েছে। 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদে সেসব অলংকরণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট পুরাকীর্তিস্থলগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে। উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ হুগলীর কোন কোন স্থানের মত হাওড়া জেলারও কিছু এলাকায় ২′ (৬১ সে.মি.) থেকে ৪′ (১.২ মি.) উচ্চতার নিরেট পোড়ামাটি-মূর্তির ব্যবহার দেখা যায়। এগুলি সাধারণতঃ গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দু পাশে দ্বারপাল বা মালাজপরত সাধু হিসাবে নিবদ্ধ হত। আটকোণা রাসমঞ্চ অলংকরণের জন্য তার প্রতি কোণে স্থাপিত হত এই ধরনের বাদ্যযন্ত্রবাদিকা, মহন্ত, শিব, কৃষ্ণ, রাধিকা, গৌর, নিতাই প্রভৃতির মূর্তি। বৃহদাকারের জন্য সেগুলিকে দু তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে ভাটিতে পোড়ানোর পর একত্র সন্নিবিষ্ট করে নেওয়া হত।

মন্দিরসজ্জায় পঙ্খের অলংকরণও এ জেলায় ব্যবহৃত হয়েছে বহুল-পরিমাণে। আবার একই দেবালয়ে পোড়ামাটি ও পঙ্খের যুগপৎ ব্যবহারের নিদর্শনও কম নয়। শেষোক্ত শ্রেণীর দেবগৃহগুলি সাধারণতঃ সে সময়ে নির্মিত যখন মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির কালে পঙ্খ-সজ্জা ধীরে ধীরে তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল। (উৎসাহী পাঠক পঙ্খের কাজের উপাদান ও প্রয়োগপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণের জন্য ১৩৮২ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঙ্খের কাজ' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখতে পারেন)।

এ গ্রন্থের পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত মোট ২৩৪টি মন্দিরে উপাসিত দেবদেবীর সংখ্যা স্থানীয় ধর্মজীবনের পরিচয় বহন করে। সমীক্ষায় প্রকাশ, শিবমন্দিরের সংখ্যা ১৩০; নামান্তরভেদে শালগ্রাম-বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-রাধিকার মন্দির ৫৯টি, শাক্ত দেবী দুর্গা, চণ্ডী, কালী, চামুণ্ডা প্রভৃতির মন্দির ১৭টি, ধর্মরাজের মন্দির ১১টি, বিশালাক্ষীর ৬টি, শীতলা-মনসার ২টি ও অন্যান্য ৯টি।

এ জেলার বিভিন্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে স্থপতি-কারিগরদের নাম ও নিবাস উল্লিখিত থাকায় তাঁদের কেন্দ্রীভূত বাসস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। এসব শিল্পীরা নিজেদের 'সূত্রধর' বা 'মিস্ত্রী' বলে এবং তাদের পদবী চন্দ্র, রায়, দে সেন, কর্মী, দাস, মাইতি ও রক্ষিত প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের প্রধান বসতিগুলি ছিল খলে (খলিয়া), রাউতাড়া, ঝিখিরা, রায়চক, ভোজান, কেশবপুর ও ক্ষেমপুর প্রভৃতি স্থানে। গ্রামগ্রামান্তরে অনুসন্ধানে প্রকাশ, বিনোলা-কৃষ্ণবাটি ও নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি গ্রামেও তাঁরা বসবাস করতেন। পার্শ্ববর্তী হুগলী জেলার সেনহাটি, বিনগ্রাম, রাজহাটি, আঁটপুর ও ময়াল এবং মেদিনীপুর জেলার রামবাগ থেকে আগত স্থপতি-ভাস্করেরাও এ জেলার বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছেন, যা 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' অধ্যায়ের যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। এসব শিল্পীর মধ্যে একজনের একাধিক মন্দির তৈরীর দৃষ্টান্ত দেখা যায় গণেশপুর ও কল্যাণপুর গ্রামের কালীমন্দির নির্মাণে রাউতাড়ার রামপ্রসাদ চন্দ্র মিস্ত্রীর ক্ষেত্রে। আবার ইছাপুর গ্রামের উমাপতি শিবের মন্দিরনির্মাতা লিপিফলকে নিজেকে 'দিগাম্বর পুত্র' বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু চোঙঘুরালি গ্রামের কল্যাণেশ্বর শিবের মন্দিরে তাঁর পরিচয়লিপির পাঠ—(সেনহাটির) "শ্রীদিগাম্বর দে, তস্য পুত্র শ্রীরামকুমার দে।" মনে হয়, সে সময় হুগলী জেলার সেনহাটি গ্রামের দিগাম্বর দে এমন একজন বিখ্যাত কারিগর ছিলেন যে, তাঁর বংশধরেরা প্রথমে তাঁর নামোল্লেখ করে তারপর নিজেদের পরিচয় দিতেন। ওই জেলার রাজহাটি গ্রামের পঞ্চানন মিস্ত্রী, ওরফে পাঁচু মিস্ত্রী, কল্যাণচক গ্রামের পরেশনাথ শিবের মন্দির ও দুর্গাদালান এবং পেঁড়ো গ্রামের শিখর-মন্দিরটি নির্মাণ করেন। হাওড়ার রায়চক গ্রামের মহেশচন্দ্র সেন সূত্রধরও চোঙঘুরালি এবং দেবীপুর গ্রামের দুটি মন্দিরের নির্মাতা। বহু মন্দিরলিপিতে স্থপতির নাম উল্লিখিত হলেও তাঁদের নিবাসের উল্লেখ নেই। যথা, কল্যাণপুরের নবরত্ন মন্দিরের বলাই রায়, গজা গ্রামের নবরত্ন মন্দিরের রামকান্ত মিস্ত্রী

ও একই গ্রামের শিবমন্দিরের শ্রীমানিক রাম, গৌরাঙ্গচকের ধর্মমন্দিরের স্বরূপ মিস্ত্রী, পেঁড়ো গড়বাড়ির বিশ্বেশ্বর শিবের মন্দিরের কীর্ত্তু মিস্ত্রী, বিনোদবাটির শিবমন্দিরের যতীন্দ্র মিস্ত্রী, গাজীপুরের শিবমন্দিরের গুরুচরণ দাস মিস্ত্রী, মাকড়দহের মাকড়চণ্ডী মন্দিরের রামকানাই দাস ও রাউতাড়ার সীতারামজীউ মন্দিরের গোপাল কর্মী।

এসব 'সূত্রধর'-শিল্পীরা কাঠ-খোদাইয়ের কাজেও অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। বরদাবাড় গ্রামের ছাউলে ও আদক পরিবারের গৃহদেবতার মন্দিরদ্বারে এবং রাধাপুর গ্রামের মন্দিরের দরজায় 'টেরাকোটা'-সজ্জার অনুরূপ 'বা রিলিফ' পদ্ধতিতে কাঠ খোদাই-করা বহু উৎকৃষ্ট মূর্তি ও নকাশি অলংকরণ দেখা যায়। এই শিল্পীগোষ্ঠী কাঠের দেবদেবীমূর্তিও তৈরি করতেন। দৃষ্টান্ত—কলিকাতার শ্যামাকালী, নজরপুরের বৃন্দাবনজীউ, দেউলপুরের সিংহবাহিনী, গড়বালিয়ার গৌরনিতাই, নিজবালিয়ার সিংহবাহিনী, নাইকুলির বিশালাক্ষী, ঝিখিরার গড়চণ্ডী ও জয়চণ্ডীমূর্তি এবং খোকার দামোদরজীউর খোদাই-কাঠের সিংহাসন। এই জেলার থলিয়ার 'সূত্রধর'-শিল্পী যামিনীকান্ত রক্ষিত যে পার্শ্ববর্তী হুগলী জেলার দিলাকাশ গ্রামের ভৈরবীমূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন, সেকথা মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়। এ জেলার গ্রামগ্রামান্তরে যেসব 'বৃষকাষ্ঠে'র নিদর্শন আছে তাও এই শিল্পীসম্প্রদায়ের দারুতক্ষণশিল্পে নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এ ছাড়া ছোটবড় কাঠের রথ ও সেগুলির সজ্জায় ব্যবহৃত নিরেট কাঠের মূর্তি এবং রথের গায়ে রঙিন চিত্রাঙ্কণ থেকেও তাঁদের বহুমুখী প্রতিভার সাক্ষ্য মেলে।

এ জেলায় মসজিদ দরগা বা মাজার, সংখ্যায় অল্প হলেও, প্রাচীনত্বের নিরিখে কম উল্লেখযোগ্য নয়। এখানে কখনও কোন 'টেরাকোটা'-মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় সতরো শতক ও পরবর্তীকালের কয়েকটি মসজিদ এখনও দেখা যায় চেঙ্গাইল, শিবগঞ্জ ও জগৎবল্লভপুর গ্রামে। রাউতাড়া গ্রামের মানিক পীরের দোচালা-রীতির দরগাটি আকারে ছোট হলেও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। (এই কৌতূহলোদ্দীপক ইমারতটির বিস্তৃত বিবরণের জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদের 'রাউতাড়া' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বাণীবন গ্রামের জঙ্গলবিলাস পীরের মাজারের নির্মাতারা হিন্দু না মুসলমান সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। (পুরাকীর্তি পরিচ্ছেদের 'বাণীবন' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ জেলার প্রথম গির্জাটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কুলেন প্রেসে মিশনারী মিঃ স্ট্যাথাম কর্তৃক নির্মিত হয়। হাওড়ার

রেল-লাইন স্থাপনের স্থান সংকুলানের জন্য ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সে গির্জাটিকে তৎকালীন ডবসনস্ লেন ও কিংস্ লেনের সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গথিক'-স্থাপত্যের এক নতুন উপাসনালয়। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার শিক্ষণের জন্য শিবপুরের বিশপস্ কলেজপ্রাঙ্গণে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গথিক'-রীতির সেন্ট টমাস গির্জা। অতঃপর তখনকার কুলেন প্লেসে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'আয়োনিক-শৈলীর রোমান ক্যাথলিক গির্জাটি নির্মিত হয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় কেন্দ্রীভূত ব্রাহ্মধর্ম এ জেলার হাওড়া, বাঁটরা, বাগনান, উলুবেড়িয়া, আমতা প্রভৃতি থানা এলাকায় প্রসারলাভ করে। আমতা থানার এ ধর্ম-আন্দোলনের প্রবর্তক ফকিরদাস রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অমরাগড়ি গ্রামে যে নববিধান ব্রাহ্ম উপাসনালয়টি স্থাপিত হয় তার সঙ্গে কলকাতার কেশব সেন ষ্ট্রীটের ব্রাহ্ম মন্দিরের সাদৃশ্য আছে। ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদের 'অমরাগড়ি' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

অমরাগড়ি : হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুনশীরহাট বা রানীহাটি হয়ে নিয়মিত বাস চলে) আমতায় পৌঁছে, দামোদরের ওপারের বেতাই-বন্দর থেকে আমতা-ঝিখিরা পিচ-রাস্তায় (নিয়মিত ট্যাক্সি-বাস চলে) ৬ মাইল (৯.৭ কি.মি.) দূরে আমতা থানার পশ্চিম প্রান্তের গ্রাম—অমরাগড়ি (জে. এল. নং ৭১)। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি, আঠারো শতকে নির্মিত পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট অলংকরণযুক্ত দুটি মন্দির। প্রথমটি ১৬৫১ শকাব্দে (১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত রায় পরিবারের দক্ষিণমুখী, আটচালা গজলক্ষ্মী মন্দির। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১২' (৩.৭ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের সামনের ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা-খিলানের ('ভল্ট'-এর) উপর এবং গর্ভগৃহের গম্বুজাকৃতি ভিতরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত। প্রথাগত লঙ্কাযুদ্ধের বদলে খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির অলংকরণে উৎকীর্ণ হয়েছে প্রচুর প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কল্পলতা। ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক দুটি সারির নীচেরটিতে দেখানো হয়েছে বন্দুকধারী ইউরোপীয় সৈন্যের কুচকাওয়াজ এবং রণবাদ্য ও বাদকসহ ঢাল-তলোয়ার হাতে দেশী পদাতিকের মিছিল। উপরের সারিটিতে প্রথাগত কৃষ্ণলীলা-দৃশ্যের পরিবর্তে উৎকীর্ণ হয়েছে হাঁস ও গরুর পালের ভাস্কর্য। খিলান-বাহী পূর্ণস্তম্ভ দুটিতে রয়েছে কৃষ্ণলীলা, যূথবদ্ধ হরিণ এবং হংসলতা প্রভৃতি। কিছু মিথুনদৃশ্যও ছিল কিন্তু সেগুলি ইচ্ছা করেই নষ্ট করা হয়েছে। বিগ্রহ বর্তমানে স্থানান্তরিত এবং অবহেলার ফলে মন্দিরটি ধ্বংসোন্মুখ।

অমরাগড়ির অপর উল্লেখযোগ্য মন্দির, রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দধি-মাধবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। বিগ্রহ শালগ্রামশিলা। শুধু সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ পোড়ামাটি-সজ্জার উৎকর্ষে এটি যে হাওড়া জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির তাতে সন্দেহ নেই। বাইরের তিনটি খিলানশীর্ষে উৎকীর্ণ লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যের মধ্যে আকর্ষণীয় মৃৎফলক হল অশোকবনে সীতা, শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণের পতন ও হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন প্রভৃতি। অনুচ্চ ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক দু সারি 'টেরাকোটা'-সজ্জার উপরের সারিতে আছে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য এবং নীচের সারিতে

ইউরোপীয় জাহাজ ও নাবিক, হাতি বা ঘোড়ার পিঠ থেকে শিকার, বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতিক বাহিনী, ঘোড়ার গাড়িতে প্রমোদভ্রমণ, পালকি-বাহিত 'বাবু' ও দু একটি মিথুন-ভাস্কর্য যা থেকে সমকালীন সমাজ-জীবনের অনেক পরিচয় মেলে। শিকারদৃশ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গের এ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পোড়ামাটি-সজ্জার সঙ্গে তুলনীয়। পূর্ণ এবং অর্ধস্তম্ভগুলিতে প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলাই উৎকীর্ণ, তবে বাঁ দিকের পূর্ণস্তম্ভের গায়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশসমেত দুর্গামূর্তিটি অপূর্ব। সামনের অলিন্দ থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে হরধনুভঙ্গ, শূর্পণখার নাসিকাছেদন ও বানর সেনার সেতুবন্ধনের দৃশ্য এবং দু ধারে পোড়ামাটির দুটি বিশালকায়(প্রায় ৩' বা ৯২ সে.মি. উচ্চতায়) দ্বারপালমূর্তি যেগুলি এখন, হায়, কলিচুনের গাঢ় প্রলেপে আবৃত। এ মন্দিরের পশ্চিমের দেওয়ালে অতিরিক্ত প্রবেশপথটির দু পাশেও অনুরূপ দুটি দ্বারপালমূর্তি 'সংস্কার'-এর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এখনও খুব বীরত্ব-ব্যঞ্জক আছে। হাওড়া ও সংলগ্ন হুগলী জেলার দক্ষিণাংশে একদা এজাতীয় দ্বারপাল ও বিভিন্ন সঙ্গীতযন্ত্রবাদিনীমূর্তির বেশ চলন ছিল। বাইরের দেওয়ালের খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির ফলকে ঈষৎ-ক্ষরিত প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ: "শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৮৬···বৈশাখ···সন ১১৭১ সাল।" অতএব এ মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ গজলক্ষ্মী মন্দিরের ৩৫ বছর পরে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায়, যথাক্রমে ১৯' ৮" (৬ মি.), ১৭' ২" (৫.২ মি.) ও প্রায় ২৫' (৭·৬ মি.), এ দেবালয়ের ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা-খিলান ('ভল্ট') এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজের দ্বারা নির্মিত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব দপ্তর অপটুভাবে মন্দিরটির কিছু সংস্কার করেছেন।

অমরাগড়ির আর এক উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য, নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠিত একটি ব্রাহ্ম উপাসনামন্দির— যার আকর্ষণীয় স্থাপত্যের সঙ্গে কলকাতার কেশব সেন স্ট্রীটের ব্রাহ্ম উপাসনামন্দিরের তুলনা করা যেতে পারে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, এই অঞ্চলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ফকিরদাস রায়ের প্রচেষ্টায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পদধূলিধন্য এই উপাসনামন্দিরটি নির্মিত হয়।

অযোধ্যা: হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বাগনান থেকে প্রায় ১২ মাইল (১৯.৩ কি.মি.) দক্ষিণে শ্যামপুর থানার

অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রাম (জে. এল. নং ৭১)। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি, ত্রিবেণীর জমিদার সিংহবাবুদের আঠারো শতকের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়জীউর মন্দির। সাবেক আটচালা দেবালয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মন্দিরপ্রাঙ্গণে চতুর্দিক খোলা দোলমঞ্চটির উত্তর দিক ছাড়া অন্য তিন দিকে দেওয়াল তুলে মন্দিরে রূপান্তরিত করে বিগ্রহ সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। পূর্বতন জরাজীর্ণ মন্দিরটির স্থাপত্যকৌশল অভিনিবেশযোগ্য। দৈর্ঘ্যে ১৭' (৫.২ মি.), প্রস্থে ১২' (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৩০' (৯.২ মি.) হওয়ায়, মন্দিরের আয়তাকার গর্ভগৃহটি পাশ-খিলানের সন্নিবেশে বর্গাকার করে গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত হয়েছে। রূপান্তরিত দোলমঞ্চটি প্রায় ৬' (১.৮ মি.) উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ছাদ চারদিকের খিলানের উপর স্থাপিত ছোট এক গম্বুজ দ্বারা রক্ষিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮' ৯" (২.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এই নবনির্মিত দেবালয়টির পুব দিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির দু লাইনের যে লিপিফলকটি আছে সেটি বর্তমানে এতদূর ক্ষয়িত যে, তা থেকে প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় বা প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় করা যায় না।

আঁদুল : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-খড়্গপুর শাখায় হাওড়া থেকে ৮ মাইল (১৩.১ কি.মি.) পশ্চিমে আঁদুল রেল-স্টেশন। সেখান থেকে সাইকেল রিক্শয় মাইল খানেক দূরে শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আঁদুল গ্রামে (জে. এল. নং ২৯) পৌঁছনো যায়। হাওড়া রেল-স্টেশনের সামনে থেকে আঁদুলগামী বাসেও সেখানে যাওয়া চলে।

আঁদুল 'রাজবংশ'-এর তক্তাসনটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে যে ধনী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাঁদেরই একজন, রামলোচন রায়, ছিলেন ক্লাইভের দেওয়ান ও আঁদুল 'রাজ-বংশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব পান। এ পরিবারের দৌহিত্রবংশীয়েরা বর্তমানে এ বংশের উত্তরাধিকারী। সামনের অংশে অতি বৃহৎ গ্রীসীয় স্তম্ভশোভিত এত বিশাল জমিদারবাড়ি পশ্চিমবাংলায় বিরল। সম্ভবতঃ রামলোচন রায়ের সময়ে নির্মিত, এ পুরাকীর্তির বর্তমান অবস্থা কিছু জীর্ণ হলেও সেকালের গৃহস্থাপত্যে ইউরোপীয় প্রভাবের এটি এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

প্রাসাদের সংলগ্ন প্রাকারবেষ্টিত ঠাকুরবাড়ির প্রবেশপথ এক নহবৎ-খানার নীচ দিয়ে ভিতরের বাঁধানো চত্বরে গিয়ে পড়েছে। তার দু পাশে সাতটি করে, মোট চোদ্দটি প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সামনের তিন

কুঠরিযুক্ত ঠাকুরদালানের একটিতে গৃহদেবতা অন্নপূর্ণা ও ভিখারী শিবের মূর্তি রক্ষিত। দুটি মূর্তিই অষ্টধাতুর এবং উচ্চতায় প্রায় ১´৬" (৪৬ সে. মি.)। অন্য দুটি কুঠরির একটিতে আছেন শালগ্রাম-বিষ্ণু ও গোপালমূর্তি এবং অন্যটির বিগ্রহ সাতটি শিবলিঙ্গ যাদের যৌথ নাম বাণেশ্বর-শিব। এখানকার প্রধান উৎসব চৈত্রসংক্রান্তির গাজন, শিবরাত্রি ও বিগ্রহগুলির প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান এখনও প্রতিপালিত হয় বটে, তবে বর্তমানে জাঁকজমক আগেকার তুলনায় অনেক কম।

এ গ্রামে ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী এক অলংকরণহীন আটচালা মন্দিরের সংক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠালিপি "১৬৯৩ শকাব্দ" (১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ)।

আমতা: হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুন্সীরহাট বা রানীহাটি হয়ে নিয়মিত বাস চলে) হাওড়া থেকে সরাসরি দূরত্বে প্রায় ৫০ মাইল (৮০·৫ কি. মি.) পশ্চিমে, দামোদরের পূর্ব-তীরে আমতা থানার সদর আমতা গ্রাম (জে.এল. নং ১৪৩)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি, এ জেলার প্রখ্যাত লৌকিক দেবী মেলাইচণ্ডীর ইটের আটচালা মন্দির। জনশ্রুতি, সতীর হাঁটুর মালাইচাকি দামোদরের অপর তীরবর্তী জয়ন্তী গ্রামে পতিত হওয়ায় এ দেবীর নাম হয় মালাই-(মেলাই)চণ্ডী এবং তাঁর অধিষ্ঠানক্ষেত্র হয় একান্ন পীঠের অন্যতম। দেবীর পূজার্চনায় নিযুক্ত আমতাবাসী পুরোহিতের বন্যার সময় দামোদর পারাপার করতে বিশেষ কষ্ট হওয়ায় তিনি আমতায় দেবীর অধিষ্ঠান কামনা করেন। ফলে, দেবীর স্বপ্নাদেশ হয় এবং পরদিন আমতার হাটতলায় দেবীকে অধিষ্ঠিতা দেখা যায়। পরবর্তীকালে, কলকাতা হাটখোলার দত্ত পরিবারের লবণ ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের দামোদরে ডুবে যাওয়া কয়েকটি লবণবোঝাই নৌকা দেবীর প্রসাদে লবণসমেত পুনরুদ্ধার হওয়ায় তিনি বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন। কিংবদন্তী যাই হোক, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে, বিশেষত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ 'মেলাইচণ্ডীর' উল্লেখ দেখা যায়। অতএব বোঝা যায়, খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকেই আমতা এক উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল।

মেলাইচণ্ডীর দক্ষিণমুখী মন্দিরটিতে কোন পোড়ামাটির অলংকরণ ছিল কিনা জানা যায় না। কারণ, বহুবার সংস্কারের দৌলতে, দেওয়ালে চুনবালির খুব পুরু প্রলেপ পড়েছে।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও শ্রীঅমিয়কুমার ব্যানার্জী কর্তৃক সম্পাদিত (ইংরেজী) হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে এ মন্দিরের

প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে—"The date-plaque of the shrine above the entrance is illegible owing to liberal coats of whitewash, but is said to ascribe the erection of the edifice to a *karmakara* in 1056 B.S., i. e., A.D. 1649." অজ্ঞাতনামা কর্মকার-পদবীধারী এ ব্যক্তি সম্ভবতঃ নির্মাণকারী মিস্ত্রী ছিলেন। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় আনুমানিক ১৪′ (৪.৩ মি.)× ১৪′ (৪.৩ মি.)×২৫′ (৭.৬ মি.)। সামনের ত্রিখিলান অলিন্দের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজের উপরে স্থাপিত। দেবীর মূর্তিটি সিন্দুরলিপ্ত হওয়ায় সেটির অবয়ব সম্পর্কে কিছু বলা না গেলেও, পাথরের যে পাদপীঠের উপর সেটি স্থাপিত তা নিঃসন্দেহে বহু প্রাচীন। বিগ্রহের পাশে কষ্টিপাথরে নির্মিত যে বিষ্ণু-বাসুদেব ও কার্তিকেয়মূর্তি দুটি উপাসিত তাও পাল-সেন আমলের হওয়াই সম্ভব। মূল দেবালয়ের সামনে একটি পাকা নাটমণ্ডপ ছাড়াও প্রাকারবেষ্টিত মন্দির-চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেবীর ভৈরব দুর্গেশ্বর শিবের একটি ইটের, ছোট, পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির আছে। সেটিতে কোন লিপিফলক নেই, তবে জনশ্রুতি, সেটি হাটখোলার মদনমোহন দত্ত নির্মাণ করিয়ে দেন।

আমতার মধ্যস্থলে একটি ইটের, দক্ষিণমুখী, আটচালা শিবমন্দির আছে। পোড়ামাটির ভাস্কর্যবিহীন এ মন্দিরের ক্ষয়প্রাপ্ত লিপিফলকের পাঠ: "১৬৯৫ শকাব্দ……।" প্রতিষ্ঠাকাল অতএব ১১৮০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮′ (২.৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ১২′ (৩.৭ মি.)।

আসণ্ডা: উদয়নারায়ণপুর—ডিহি-ভুরশুট পিচের সড়কে (রিক্সা পাওয়া যায়) উদয়নারায়ণপুর থেকে ৩ মাইল (৪.৮ কি.মি.) উত্তরে ঘোলা গ্রামের কাছ থেকে পশ্চিমমুখী কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি.মি.) দূরে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত আসণ্ডা গ্রাম (জে. এল. নং ২)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি, মাইতি (মাহিষ্য) পরিবারের প্রতিষ্ঠিত তাঁদের গৃহদেবতা শ্রীধরনাথজীউর (শালগ্রাম) ইটের, দক্ষিণমুখী, নবরত্ন মন্দির। বিগ্রহ দোতলায় অধিষ্ঠিত; উপরে যাবার সিঁড়ি আছে। সাবেকী কাঠের রথের চার কোণে যেমন পর পর অশ্বারোহী, বাঘ, সিংহ প্রভৃতির খাড়াভাবে সাজানো 'মৃত্যুলতা' দেখা যায়, এখানেও তার অনুকরণে পোড়ামাটির সজ্জা নিবদ্ধ হয়েছে। মনে হয়, স্থপতি এ মন্দিরে প্রথাগত

রথের আদল আনবার চেষ্টা করেছিলেন। শুধু সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ এ মন্দিরের পোড়ামাটির সজ্জায় খিলানশীর্ষে লঙ্কাযুদ্ধ, দেওয়ালের দু পাশে পৌরাণিক ঘটনাবলী ও নীচে বিবিধ সামাজিক দৃশ্য ও কিছু মিথুনমূর্তি দেখা যায়। সামনের ত্রিখিলান দেওয়ালের পাদমূলে এক সারি সামাজিক দৃশ্যের ভাস্কর্য (বন্দুক-হাতে ফিরিঙ্গী সৈন্য, মল্লযুদ্ধ, বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতিক, পালকিতে সুখভ্রমণ প্রভৃতি) উৎকীর্ণ হয়েছে এবং উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলার প্রথাগত বিভিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে দু একটি মিথুনমূর্তিও উপস্থিত। খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠাফলকটির পাঠ নিম্নরূপ : "শুভমস্তু সকাব্দা ১৭১১ সাল।" অতএব, দেবালয়টি নির্মিত হয়েছিল ১১৯৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দিরটির ত্রিখিলান দালানের ছাদ 'ভলট্'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ দুটি পাশ-খিলানের উপর স্থাপিত গম্বুজের উপর রক্ষিত। দেবালয়টি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮' ১০" (৫.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০.৭ মি.)।

উল্লিখিত মন্দিরটির সংলগ্ন পশ্চিমে একই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত হরসুন্দর শিবের পূর্বমুখী একটি ইটের, অলিন্দবিহীন, আটচালা মন্দির আছে। সেটির সম্মুখভাগে পঙ্খের নকাশি কাজের মধ্যে দু লাইনের লিপিফলকটির পাঠ : "শুভমস্তু স/কাব্দা ১৭৭২ সাল।" অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকাল ১২৫৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫' (৪.৬ মি.) এবং এটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

গ্রামের বেরাপাড়ায় বেরা পরিবারের গৃহদেবতা সীতারামজীউর (শালগ্রাম) দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য। আঠারো শতকে নির্মিত এ দেবালয়ে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও ভিত্তির সামনের গায়ে 'টেরাকোটা'-ফলকে যে সংস্কারলিপিটি আছে তার পাঠ নিম্নরূপ : "সিতারাম / সন ১১৭৬ সাল / সন ১১৭০ সাল / তারিখ ৮ বৈসাখ/মাস দাগরাজি হইয়া/ শ্রীরামেশ্বর মিস্তি, সাং / বিনগ্রাম শ্রীহলধর / বেরা সখা তারিখ।" 'সখা' শব্দটির ব্যবহার বেশ অভিনব। সংস্কারকর্তা হলধর বেরার সঙ্গে পরবর্তীকালে শিল্পী-স্থপতির বন্ধু হিসাবে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠায় হয়ত লিপিফলকে তাঁর উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে। সামনের দেওয়ালে কতকগুলি পোড়ামাটির প্রস্ফুটিত পদ্ম ছাড়া অন্য কোন 'টেরাকোটা'-অলংকরণ নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' (৩.৪ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.), এ মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। রক্ষণাবেক্ষণের

অভাবে এটির পশ্চিম দিকের একটি কোণ ক্ষতিগ্রস্ত এবং উপরে কিছু গাছপালাও গজিয়েছে।

কাছাকাছি শিবতলায় আর একটি পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দির আছে। বুড়োশিবের নামে পরিচিত ও দৈর্ঘ্যে ১৪′ ২″ (৪.৪ মি.), প্রস্থে ১৩′ ৩″ (৪.১ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, স্থাপত্যের নিরিখে, মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

ইছানগরী : ভূতপূর্ব মার্টিন-রেলের হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা শাখায়, হাওড়া থেকে প্রায় ২০ মাইল (৩২.২ কি.মি.) উত্তর-পশ্চিমে ছিল ইছানগরী রেল-স্টেশন। ভবিষ্যতে এ রেলপথ আবার ব্যবহারযোগ্য হলে, সেখানে ট্রেনে যাওয়াই সুবিধা। অন্যথায়, হাওড়া-জগৎ-বল্লভপুর-উদয়নারায়ণপুর পিচের সড়কে হাওড়া থেকে বাসে করেও জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ইছানগরী গ্রামে (জে. এল. নং ১) পৌছনো যায়।

পিচের রাস্তার পাশেই পূর্বতন ইছানগরী রেল-স্টেশনটির ফার্লং খানেক (২০০ মি.) দক্ষিণ-পশ্চিমে পরিত্যক্ত ও আগাছা-আবৃত, ইটের, দক্ষিণমুখী, ভগ্ন, একদুয়ারী, আটচালা গড়চণ্ডী-মন্দিরটিই এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। উপরের চারচালাটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ায়, এ দেবালয়ের বর্তমান উচ্চতা ১৮′-এর (৫.৫ মি.) বেশী নয়: দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, যথাক্রমে, ১২′ ১০″ (৪ মি.) ও ১০′ ১০″ (৩.৪ মি.)। পোড়ামাটির সজ্জা (অধুনা বেশ ক্ষয়িত) কেবলমাত্র দক্ষিণের দেওয়ালেই নিবদ্ধ। কুলঙ্গির ভিতরে স্থাপিত মূর্তির দুটি সারি প্রবেশপথের তিন দিক প্রদক্ষিণ করে এসেছে। দেওয়ালের অবশিষ্ট অংশে ফুলকারি নকশা ও মূর্তি-ভাস্কর্য দেখা যায়। তার মধ্যে ভিত্তিবেদীর সমান্তরাল নীচের সারিটিতে প্রথাগত সামাজিক দৃশ্য ও উপরের সারিটিতে কৃষ্ণলীলার ভাস্কর্যগুলির কারিগরি প্রশংসনীয়। এই অংশে দুটি মিথুনদৃশ্যও আছে। কুলঙ্গি-অন্তর্বর্তী প্যানেলগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ বিবিধ যোদ্ধা, প্রহরী, মহন্ত, সুন্দরী ইত্যাদি। মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর রক্ষিত। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ দেবালয়টিকে, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিরিখে, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত বলে মনে হয়। সাবেক গড়চণ্ডীমূর্তিটি বহুকাল পূর্বে অপহৃত হওয়ায় অরক্ষিত মন্দিরটির বহু 'টেরাকোটা'-টালিও অদৃশ্য হয়েছে।

ইছাপুর : হাওড়া-মুনশীরহাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে প্রায় ১৫ মাইল (২৪.২ কি.মি.) উত্তর-পশ্চিমে পাতিহাল। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ২২ মাইল (৪ কি.মি.) দক্ষিণে নিজবালিয়া হয়ে আরও দক্ষিণে প্রায় ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) গেলে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৪৪)। এখানকার শিবতলায় উমাপতি-শিবের ইটের, পশ্চিমমুখী একটি আটচালা মন্দির আছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ ৪″ (৩.৫ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ১৫′ (৪.৬ মি.), এ মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। অলংকরণবিহীন এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ ঈষৎ ক্ষয়িত প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "সন ১২৭৪ সাল / সাকিম ইছাপুর / শ্রী·········ঘড়া / শ্রীদিগাম্বর পুত্র।" সুতরাং, স্থানীয় ঘড়া পরিবারের কোন পূর্বপুরুষ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

গ্রামের ভূঁয়েপাড়ায় ঘড়া পরিবারের প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন একটি ছয়কোণা, পরিত্যক্ত রাসমঞ্চ আছে। রাসমঞ্চটির বিশেষত্ব, সেটির সম্মুখভাগে, উপরের দিকে, শিঙ্গাহস্তে উপবিষ্ট প্রায় ২½′ (৭৬ সে. মি.) উচ্চতার পোড়ামাটির এক শিবমূর্তি এবং প্রতি কোণে, উপরের দিকে ডান হাত প্রসারিত অবস্থায় দণ্ডায়মান ও একই উচ্চতার ছটি পোড়ামাটির নগ্ন নারীমূর্তি। শেষোক্ত ভাস্কর্যগুলির ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সেগুলি কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বস্ত্রহরণ-দৃশ্যের লজ্জাকাতরা গোপিনী। রাসমঞ্চটি ছাড়া, ঘড়াপাড়ায় আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত ঘড়া পরিবারের পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চটি উল্লেখযোগ্য। আটকোণা এ দোলমঞ্চের প্রতি কোণে প্রায় ১′ ৬″(৪৬ সে.মি.) উচ্চতার নিরেট পোড়ামাটির কৃষ্ণ, বলরাম, রাধিকা প্রভৃতির মূর্তি ছাড়া অন্যান্য ভাস্কর্য বর্তমানে বিনষ্ট।

ইসলামপুর : 'মাজুক্ষেত্র' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাজুক্ষেত্রের ১½ মাইল (২.৪ কি. মি.। উত্তর-পূর্বে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ইসলামপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৭৬)। স্থানীয় শিবতলায় এক অলিন্দবিহীন, আটচালা শিবমন্দির এবং ধর্মতলায় ধর্মরাজের এক-দুয়ারী, আটচালা ধর্মমন্দির এখানকার উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। দুটি দেবালয়ই পশ্চিমমুখী এবং স্থানীয় মেটে পরিবারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায়, যথাক্রমে, ১৫′ ৩″ (৪.৭ মি.), ১৪′ ৩″ (৪.৪ মি.) এবং আনুমানিক ৩০′ (৯.২ মি.) শিবমন্দিরটির ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাল-খিলান ও চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। ধর্ম-

রাজের মন্দিরটি ৫′ (১.৫ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৬″ (৩.২ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ পাশ-খিলানের সাহায্য ছাড়াই চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। প্রতিষ্ঠাফলকের অভাবে স্থাপত্যগত বিচারে দুটি মন্দিরই উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

উত্তর ঝাঁপড়দহ : হাওড়া-ডোমজুড় বাসপথে ডোমজুড়ে নেমে, পাকা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত উত্তর ঝাঁপড়দহ গ্রামে (জে. এল. নং ৯) পৌঁছনো যায়। মার্টিন-রেলের হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা শাখা ভবিষ্যতে আবার চালু হলে, ডোমজুড় স্টেশনে নেমেও সেখানে যাওয়া যাবে। স্থানীয় চামুণ্ডা দেবী এ অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত এবং জাগ্রত বলে কথিত। স্মরণাতীত কাল থেকে তিনি নাকি এক প্রাচীন অশ্বত্থগাছের তলায় এক প্রস্তর-খণ্ডরূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। পরে, সেবায়ত চক্রবর্তী পরিবারের প্রচেষ্টায়, ৭০/৮০ বছর আগে তিনি এক দালান-মন্দিরে স্থানান্তরিতা হন। তাঁর ধ্যান কালীর কিন্তু প্রধান বাৎসরিক উৎসব হয় দুর্গা-অষ্টমীর দিন। বৈশাখী ও মাঘীপূর্ণিমাতেও বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-তিথিগুলি থেকে এই লৌকিক দেবীর মিশ্র সত্তা অনুধাবন করা যায়। দেবী চামুণ্ডার মূর্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচলিত এক কিংবদন্তী — তিনি নাকি স্বপ্নাদেশ দিয়ে এক দহ থেকে আবির্ভূতা হন এবং শ্রীমন্ত সদাগর সরস্বতী নদীপথে বাণিজ্যে যাওয়ার সময় তাঁর পূজার্চনা করায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মতান্তরে, শ্রীমন্ত সদাগর নিরাপত্তার জন্য প্রতি দহের কাছেই চামুণ্ডার পূজা দিতেন। এখানে পূর্বতন কোন চামুণ্ডা-বিগ্রহ না থাকায় এ দেবী তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও প্রথম উপাসিত হয়। প্রধান বিগ্রহের বাঁ পাশে এক শিবলিঙ্গ ও ডান দিকে ষষ্ঠী দেবীও ভক্তিভরে উপাসিত।

উত্তর বাসুচক : 'পেঁড়ো' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে মাদারিয়া খালের পশ্চিম দিকের বাঁধ ধরে দক্ষিণমুখী কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি.মি.) গিয়ে পশ্চিমমুখী কাঁচা রাস্তায় আরও ১ মাইল গেলে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণচক মৌজাভুক্ত উত্তর বাসুচক গ্রাম (জে.এল. নং ১৬৭)। স্থানীয় চক্রবর্তীপাড়ায় রাধাকৃষ্ণজীউর দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি এখানকার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ এবং প্রতিষ্ঠাতা পাশের

নারিকেলবেড়িয়া গ্রামনিবাসী জগন্নাথ বাগ। কিংবদন্তী, তিনি গুপ্তধন পেয়ে তাঁর গুরুবংশ চক্রবর্তী পরিবারের গৃহদেবতা রাধাকান্তজীউর এই মন্দির নির্মাণ করান। এজন্য প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তির দিন বিগ্রহটিকে পালকি করে বাগ পরিবারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে একদা পোড়ামাটির কাজ ছিল কিন্তু সংস্কারের দৌলতে কয়েকটি প্রস্ফুটিত পদ্মের ফলক ছাড়া বর্তমানে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রবেশপথের উপরে, কার্নিসের নীচে, পোড়ামাটির ফলকে যে তিন পঙ্‌ক্তির লিপিফলকটি আছে তার পাঠ নিম্নরূপ: "শুভমস্তু শকা / ব্দা ১৭১৩ সন ১১ / ৯৮ সাল রাধাকান্ত.............।" ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়ের ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যে সংস্কার হয়েছিল তার উল্লেখ প্রবেশপথের বাঁ দিকে শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ লিপিফলকটিতে দেখা যায়। যথা—"শ্রী শ্রীরাধাকান্ত জীউ/১১৯৮ সাল/নারিকেলবেড়ে নিবাসী জগন্নাথ বাগ কর্তৃক স্থাপিত/তস্য পুত্রবধূ ক্ষেত্রময়ী দাসীর/ব্যয়ে তৎপুত্র শ্রীপাঁচকড়ি বাগ/দ্বারায় ১৩২৭ সালের/আশ্বিন মাহায়/মেরামত হইল।" মন্দিরটির সামনের বাঁকানো চাল বরাবর সিমেন্ট-কংক্রীট ঢালাই করে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি চালা সংযোজন করা হয়েছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪'৬" (৪.৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

উদয়নারায়ণপুর: হাওড়া-উদয়নারায়ণপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) উদয়নারায়ণপুর থানা-সদরের ১ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উদয়নারায়ণপুর মৌজা (জে. এল. নং ১৭)। পাশাপাশি একজোড়া আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। দক্ষিণমুখী দেবালয় দুটির একটিতে শিব ও অন্যটিতে কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত। অলংকরণবিহীন উভয় মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দুটিই সমান মাপের এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' (৩.৪ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.)। প্রতিষ্ঠা-লিপির অভাবে, গঠনরীতির নিরিখে, প্রতিষ্ঠাকাল উনিশ শতকের মধ্য-ভাগ বলে মনে হয়।

উলুবেড়িয়া: হাওড়া জেলার অন্যতম মহকুমা-শহর (জে. এল. নং ১০৯)। হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের উলুবেড়িয়া স্টেশনে নেমে সাইকেল-রিক্শয় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) পুবে অথবা, হাওড়া-উলুবেড়িয়া পিচের সড়কে বাসে করে সেখানে যাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মেদিনীপুর জেলার হিজলীতে যখন জোব চার্নকের সৈন্যদের সঙ্গে বাংলার নবাব-ফৌজের যুদ্ধ বাধে তখন থেকেই এই অখ্যাত গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। যুদ্ধে পরাজিত ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তার এক প্রধান শর্ত ছিল - হুগলীতে আগেকার মত কুঠি বহাল রাখা সাপেক্ষে ইংরেজরা উলুবেড়িয়াতেও বসতি স্থাপন করতে পারবে। সেইমত জোব চার্নক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্ধেক রণতরী নিয়ে উলুবেড়িয়ায় এসে হাজির হন। উলুবেড়িয়াতে ডক তৈরী ও জাহাজ মেরামতের সুবিধার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অগস্ট চার্নককে লিখে জানান যে, মোগল দরবার থেকে প্রয়োজনীয় ফরমান লাভ করা গেলে, ভাগীরথীতীরবর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি উলুবেড়িয়াতেই স্থাপন করা উচিত। কিন্তু চার্নক পরে মত পরিবর্তন করে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগস্ট সুতানুটিতে পরবর্তীকালের শহর কলকাতার পত্তন করেন। এইভাবে, অল্পের জন্য উলুবেড়িয়া পূর্বভারতে ইংরেজদের প্রধান কেন্দ্র হবার সুযোগ হারায়।

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের 'পাইলট চার্ট'-এ এবং ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের রেণেল-এর ম্যাপে এ স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরীযাত্রীদের জন্য কটক রোড (ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড) নির্মিত হওয়ায় এবং এখানে একটি পান্থশালা প্রতিষ্ঠার কারণে উলুবেড়িয়া ক্রমশই বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

প্রাচীন উলুবেড়িয়ার কোন পুরাকীর্তি এখন অবশিষ্ট না থাকলেও, শতাধিক বৎসর পূর্বে খনিত 'মেদিনীপুর ক্যানাল'-এর অংশ আজও এখানে বিদ্যমান। পুরাতন নথিপত্রে এ খালটিকে কোথাও বলা হয়েছে 'উলুবেড়িয়া হাই-লেভেল ক্যানাল' আবার অন্যত্র 'টাইড্যাল ক্যানাল'। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ইরিগেশন এ্যাণ্ড ক্যানাল কোম্পানী' উলুবেড়িয়া থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত নাব্য জলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই খাল খননের কাজ শুরু করে এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী তত্ত্বাবধানে এই জলপথ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। উলুবেড়িয়ার কাছে ভাগীরথী থেকে দামোদরের পূর্ব তীরে প্রসাদপুর পর্যন্ত ৮ মাইল (১৩ কি. মি.) খাল ৯২' (২৮ মি.) চওড়া এবং ৯' (২.৭ মি.) গভীর করে এবং দামোদরের পশ্চিমতীরবর্তী কুলিতাপাড়া থেকে রূপনারায়ণ নদের পূর্ব তীরে কাঁটাপুকুর পর্যন্ত ৪ মাইল (৬.৫ কি.মি.) খাল ১২০' (৩৬৬ মি.) চওড়া ও ১৪' (৪.৩ মি.) গভীর করে কাটা হয়

এবং প্রতি নদীর মুখে জল নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত কারিগরির সরঞ্জামসহ 'লক গেট' বসানো হয়। পরবর্তীকালে রূপনারায়ণের মুখে চড়া পড়ায় এবং বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে রেলপথ নির্মিত হওয়ায়, ওই কাটা খাল অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহার্য হয়ে পড়ে।

উলুবেড়িয়ায় ভাগীরথীতীরবর্তী আনন্দময়ী কালীর ইটের, দক্ষিণমুখী, সুউচ্চ নবরত্ন মন্দিরটি বয়সের নিরিখে পুরাকীর্তি না হলেও উল্লেখ্য। লিপিফলক অনুসারে, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার রামবাগের স্থপতি চন্দ্রমোহন মাইতি এ মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে পৃথক জেলার কারিগরদের অংশগ্রহণ সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গুড়ফুলি : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের দেউলটি স্টেশনে নেমে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ১½ মাইল (২.৪ কি.মি.) দক্ষিণ-পশ্চিমে অথবা, কোলাঘাট স্টেশনে নেমে রূপনারায়ণ নদের পুব পাড়ের বাঁধ ধরে দক্ষিণ-পুব দিকে অনুরূপ দূরত্বে বাগনান থানার অন্তর্গত গুড়ফুলি গ্রাম (জে. এল. নং ২৬)। এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত মাইতি পরিবারের একটি রাসমঞ্চ আছে। আটকোণা রাসমঞ্চটির গায়ে কিছু 'টেরাকোটা'-অলংকরণ ও প্রতি কোণায় প্রায় ২' (৬১ সে. মি.) উচ্চতার কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি নিবদ্ধ। এই একই জাতীয় বৃহৎ 'টেরাকোটা'-মূর্তি (বাদ্যযন্ত্রবাদিনী, প্রহরী প্রভৃতি) হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কাছাকাছি অঞ্চলে আরও দেখা যায়। সন্দেহ নেই, সেকালের মন্দির-নির্মাতা বা কারিগরদের কাছে এই শ্রেণীর অলংকরণ একদা বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

কলিকাতা: 'অমরাগড়ি' নিবন্ধে আমতায় পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দামোদরের পুব তীরের বাঁধের উপর দিয়ে কাঁচা রাস্তায় (রিক্শ চলে) ২½ মাইল (৪ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে আমতা থানার অন্তর্গত কলিকাতা গ্রাম (জে.এল. নং ১৫২)। এই নগন্য পল্লী কলিকাতা মহানগরের নামের বুৎপত্তি সম্পর্কে যে আলোকপাত করতে পারে, সে বিষয়ে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, " 'কলি-চুন' বা চুন প্রস্তুতের জন্য 'কাতা' অর্থাৎ শামুক বা গুগলির খোলার আগুনে-পোড়ানো স্তূপ বা সমষ্টি— 'কলি' + 'কাতা' এই দুইটি সার্থক এবং এক সময়ে বহুপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দযোগে গঠিত সমস্তপদ মাত্র - এই দুটি সার্থক বাঙ্গালা শব্দের বুৎপত্তি

যাহাই হউক না কেন, শামুক বা গুগলি পোড়াইয়া চুন তৈয়ারী করা হইত বলিয়াই এই স্থানের নাম 'কলি-কাতা'।" একদা দামোদরতীরবর্তী এ অঞ্চলে কলিচুন তৈরি ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে আলোচ্য পল্লীটি বেশ বিখ্যাত ছিল। এখনও স্থানীয় কয়েক ঘর চুনারী সাবেক পদ্ধতিতে চুন উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত আছেন।

এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি, ধর্মতলায় অবস্থিত কূর্মমূর্তি-ধর্মরাজের পুবমুখী একটি ইটের আটচালা মন্দির। লৌকিক দেবতা ধর্মরাজ রাঢ় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র গাছতলায় বা ছোট ছোট দালান-মন্দিরেই পূজিত হন। আলোচ্য আটচালা দেবালয়টি সে দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে কিছু নকাশি পঙ্খের কাজ দেখা যায়। প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ চার পঙ্ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রী৺ধর্মদেবতা মন্দির তৈয়ার/হইল সন ১২০৪ সালে শ্রীগয়ারাম/দেয়াসি মন্দির দেন সাং কলিকাতা / শ্রীমৃত্যু চরণ মিস্ত্রি সাং থলে।" প্রায় ১৮০ বছরের প্রাচীন এ লিপিতেও যে গ্রামের নাম কলিকাতা বলে উল্লিখিত হয়েছে তা লক্ষণীয়। দামোদরের অপর (পশ্চিম) তীরের 'থলে' (থলিয়া) গ্রামে একদা যে বহু 'সূত্রধর'-শিল্পীর বাস ছিল (যারা মন্দির-নির্মাণ, কাঠখোদাই ও পট-অঙ্কনের কাজে দক্ষ ছিলেন), অন্যান্য সূত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮' (৫.৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·২ মি.)। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

এ দেবালয়ের সামান্য দক্ষিণে কাঁড়ার পরিবারের পুবমুখী, ভগ্ন, শিবমন্দিরটিও এখানকার আর এক পুরাকীর্তি। সেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। সংস্কারাভাবে মন্দিরটি আগাছা-সমাকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

হুগলী জেলার জনাইয়ের জমিদার মুখোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক প্রায় দেড় শ বছর পূর্বে নির্মিত এক নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও এখানে দেখা যায়। এক আধুনিক দালান-মন্দিরে রক্ষিত প্রায় ৭' (২.১ মি.) উঁচু শ্যামাকালীর কাঠের মূর্তিটি থলিয়া গ্রামের 'সূত্রধর'-সম্প্রদায়ের কাঠখোদাইয়ে উচ্চ নৈপুণ্যের নিদর্শন।

কল্যাণচক: 'গৌরাঙ্গচক' নিবন্ধে মুনশীরহাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে মুনশীরহাট-জয়নগরঘাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) নারিকেলবেড়িয়া স্টপেজে নেমে ½ মাইল

(০.৪ কি. মি.) পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত নারিকেলবেড়িয়া মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ১৭০) কল্যাণচক গ্রাম। একদা রেশম ব্যবসায়ে বিত্তশালী এই গ্রামের দ্বারী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত যে কয়টি মন্দির আছে তার মধ্যে শিবতলায় দুর্গাচরণ দ্বারীর রামেশ্বর শিবের মন্দিরটি প্রাচীনতম। একদুয়ারী, আটচালা, দক্ষিণমুখী এ মন্দিরটির সম্মুখভাগে কিছু পোড়ামাটির প্রস্ফুটিত পদ্ম ছাড়া আর কোন অলংকরণ নেই। সামনের কার্নিসের নীচে শ্বেতপাথরে ক্ষোদিত লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "প্রতিষ্ঠাতা/ মহারাজা শ্রীদুর্গাচরণ দ্বারী/ ১৬১৪ শকাব্দ।" মন্দিরটির ছাদ চারচালা ধরনের গম্বুজ ('ক্রোস্ ভোম') দ্বারা নির্মিত এবং আয়তন—দৈর্ঘ্য ১৮' ২" (৫.৬ মি.), প্রস্থ ১৫' ৮" (৪.৮ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ৩৬' (১১ মি.)।

দ্বারী পরিবারের ভদ্রাসনের সংলগ্ন চাতালে অবস্থিত পরেশনাথ শিবের পূবমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দির ও তার পাশেই একটি আটকোণা রাসমঞ্চ আছে। রাসমঞ্চ এবং অদূরের দামোদরজীউর দক্ষিণমুখী, ত্রিখিলান, দোতলা দালান-মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা উল্লিখিত দুর্গাচরণের পুত্রগণ। আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত হলেও মন্দিরটির ছাদে কড়ি-বরগা ব্যবহৃত হয়েছে এবং ছাদের উচ্চতম স্থানে দেখা যায় একটি আমলক ও তার দু পাশে দুটি সিংহের মূর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৪' ৯" (৭.৫ মি.), প্রস্থে ১৭' ৪" (৫.৩ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২.২ মি.)।

পরেশনাথ শিবমন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণের প্রপৌত্র মদন-মোহন দ্বারী। এ দেবালয়ের সম্মুখভাগে সামান্য পঙ্খের অলংকরণ আছে। প্রবেশপথের উপরে পঙ্খের পলস্তারায় ক্ষোদিত দুই পঙ্ক্তির লিপিফলকটির পাঠ—"সকাব্দা ১৭৬৫ বাঙ্গলা সন ১২৫০ সাল তাং ২২ মাঘ/ শ্রীমদনমোহন দুআরিশ্ব কারিগর শ্রীপঞ্চানন মিস্ত্রী।" মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১১' (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ২৩' (৭ মি.)। মদনমোহন দ্বারী অতিশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। মানিকুরা গ্রামের ('মানিকুরা' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) নরমাধবের মন্দিরটিও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। কল্যাণচকের পঙ্খের কাজবিশিষ্ট, ত্রিখিলান, দুর্গাদালানটিও তাঁর প্রযত্নে নির্মিত। সেটির প্রবেশপথের উপরিভাগে ফুল-লতা-পাতার অলংকরণের মধ্যে ক্ষোদিত দুই পঙ্ক্তির লিপিটি নিম্নরূপ: "সন ১২৫৯ সাল/শ্রীমদন-মোহন দুয়ারীস্ত / শ্রীদুর্গা মন্দির।" এ পরিবারের বর্তমান প্রবীণদের

মতে, পরেশনাথজীউর মন্দিরনির্মাতা হিসাবে যে পঞ্চানন মিস্ত্রীর উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ছিলেন হুগলী জেলার রাজহাটি-নন্দনপুরের অধিবাসী এবং দুর্গাদালানটিও তাঁরই কীর্তি।

কল্যাণপুর : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-মানকুর বাসপথে প্রায় ৫ মাইল (৮.১ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে বাগনান থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম (জে. এল. নং ১৪)। এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি পালপাড়ায় অবস্থিত পাল পরিবারের গৃহদেবতা শালগ্রাম-বিষ্ণু দামোদরজীউর ইটের তৈরি, পুবমুখী, নবরত্ন মন্দির। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রেশম ব্যবসায়ে ধনী, পাল পরিবারের ৺হরেকৃষ্ণ পাল এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ও মিস্ত্রীর নামোল্লেখসহ দুই পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ : স্রুভমস্তু সকাব্দা ১৭০৮ / সন ১১৯৩ সাল শ্রীল হরেকৃষ্ণ পাল শ্রী বলাই রাম।" শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের নিরিখে দেবালয়টির নির্মাণকাল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' ৪" (৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২২' (৬.৭ মি.), এ মন্দিরটির ত্রিখিলান দালানের ছাদ অর্ধ-বৃত্তাকার টানা-খিলানের দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। তিনটি খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির সজ্জায় তিন রকম বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। মধ্যস্থলে প্রথাগত রাম-রাবণের যুদ্ধ, ডান দিকে কৃষ্ণলীলা এবং বাঁ দিকে সাধারণ মানুষের লোকায়ত জীবনযাত্রা, যথা, গৃহস্থবধূর ঢেঁকিতে ধান ভানা, ধোবা-ধোবানীর কাপড় কাচা, নাপিতের ক্ষৌরকর্ম, কামারের হাপর চালানো ও তপ্ত লোহা পেটানো, তাঁতি-মেয়ের চরকায় সুতো কাটা, মায় বারাঙ্গনাজীবনের প্রকাশ্য চিত্র মিথুনদৃশ্য। সমকালীন সমাজজীবনের এমন পরিপূর্ণ চিত্রায়ন পশ্চিমবাংলার 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলিতে একান্তই বিরল। ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক সারিগুলিতে ও থামের গায়ে নিশ্চয়ই আরও সামাজিক কাহিনী, শিকারদৃশ্য ও কৃষ্ণলীলার ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখন সেগুলি ক্ষয়িত বা অপসৃত।

একই পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দালান-রীতির কালীমন্দিরটি এখানকার অপর পুরাকীর্তি। সামনের দালানের ভিতরের দেওয়ালের গায়ে, গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দু পাশে, দুটি প্রমাণ আকারের পোড়ামাটির দ্বারপাল (অধুনা পুরু কলিচুনে আবৃত) এবং ঊর্ধ্বে চুনবালির পলস্তারার উপর পদ্মের নকাশি কাজ ও পাখির সমারোহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মন্দিরের পিছনের দেওয়ালেও ছুটি পোড়ামাটির নারীমূর্তি সংস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু অযত্নের ফলে বর্তমানে সেগুলি ধ্বংসপ্রায়। এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ : "শ্রী শ্রী কালি বুড়মস্ত সখাবদা ১৭৪৪ শুক / সন ১২২৯ সাল। শ্রীরামকান্তে পাল গঠনাত / শ্রীরামপ্রসাদ মিত্রি সাং রাউতাড়া / পরগণে মণ্ডলঘাট সাং কল্যোণপুর।" এ লিপি থেকে দেবালয়টি যে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং অদূরের রাউতাড়া গ্রামে ('রাউতাড়া' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) যে একদা মন্দিরনির্মাতা মিস্ত্রীদের বাস ছিল তা প্রমাণ হয়।

মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণে রসুন-আকৃতির চূড়াযুক্ত একটি আট-কোণা রাসমঞ্চ আছে। তার প্রতিকোণে ৩' (৯২ সে. মি.) উচ্চতার যে পোড়ামাটির মূর্তিগুলি নিবদ্ধ ছিল তার মধ্যে সাহেব, মেম, বেহালা-বাদিকা ও মিথুন-ভাস্কর্যের কিছু কিছু অবশেষ এখনও দেখা যায়।

কল্যাণপুর গ্রামের আর এক পুরাকীর্তি কালরুদ্র শিবের ইটের, পলস্তারা-আবৃত, ছোট আটচালা মন্দির। জনশ্রুতি, এ শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভু। গভীর অরণ্যের বিশেষ স্থানে গরুর দুধ বর্ষণ ও পরে সেখানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আবিষ্কারের বহুশ্রুত কিংবদন্তীটি এখানেও প্রচলিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দেবালয়টি দেড় শ বছরের প্রাচীন হতে পারে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে সানবাঁধানো চাতালটি এক পীরের আস্তানা। হিন্দু ও মোসলেম উপাসনাস্থলের এহেন নিকট সহাবস্থান পশ্চিমবাংলায় বিরল।

প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদরজীউর অলংকরণবিহীন পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রায়। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, জনৈক মহাদেব প্রামাণিকের প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয় ১১৬০ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

গ্রামের পুব প্রান্তে 'বুড়ো সাহেব' পীরের প্রাকারবেষ্টিত মাজার। কিংবদন্তী, প্রায় তিন শ বছর আগে বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থেকে আগত সৈয়দ করমাতুল্লাহ্ এখানে বসতি করেন ও কালক্রমে অলৌকিক শক্তির কারণে 'বুড়ো সাহেব' পীর নামে খ্যাত হন। বর্ধমানের মহারাজা তাঁর ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়ে এক বিরাট জলাশয়সহ বহু ভূসম্পত্তি পীরোত্তর হিসাবে দান করেন। ইট-বাঁধানো বড় এক কবরের নীচে পীর সাহেবের মরদেহ শায়িত। কিছু দূরে আর আটটি কবরের অন্তিম আশ্রয়ে রয়েছেন তাঁর বিবি ও সাত ছেলে। জনশ্রুতি, পীর সাহেবের বড় ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে এমন কিছু ইন্দ্রজাল দেখান যা তাঁর পিতার কৃতিত্বের থেকেও চমকপ্রদ। সাধারণ্যে সম্মানহানির ভয়ে

ঈর্ষাকাতর 'বুড়ো সাহেব' একে একে তাঁর সাতটি পুত্রকেই নাকি হত্যা করেন। ঈর্ষাদ্বেষের ওপারে, পরম শান্তিময়ী ধরিত্রীর কোলে, আজ তাঁরা সকলেই কাছাকাছি চিরনিদ্রিত। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণ এই মাজারে এসে মানত করেন, মনোবাসনা পূর্ণ হলে শিরনি দেন।

কানাইপুর : বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-শিবগঞ্জ বাসপথে বাঁটুল গ্রামে নেমে, ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) পূবে, বাগনান থানার অন্তর্গত কানাইপুর গ্রাম (জে.এল.নং ৯১)। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বিশ্বেশ্বর শিবের উত্তরমুখী আটচালা মন্দির। শিবলিঙ্গটি কষ্টিপাথরে নির্মিত। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১৪' (৪.৩ মি.), প্রস্থ ১২' (৩.৭ মি.) ও উচ্চতা আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.)। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। কোন প্রতিষ্ঠা-লিপি নেই তবে গঠনশৈলী দেখে মনে হয়, দেবালয়টি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত।

সম্প্রতি স্থানীয় মোহনদীঘি নামে এক প্রাচীন জলাশয় খননকালে যেসব পুরাবস্তু পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শাহ্ আলমের সময়কার দুটি রৌপ্যমুদ্রা, একটি ধূসর রঙের পোড়ামাটির কূর্মাকৃতি প্রদীপ ও তিনটি আংটা-লাগানো মাটির দোয়াতদানি। এগুলি বর্তমানে বাগনানের অদূরে নবাসন গ্রামের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে।

কাঙ্গপাট : 'গৌরাঙ্গচক' নিবন্ধে মুন্সীরহাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে মুন্সীরহাট-জয়নগরঘাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জয়নগরঘাটে দামোদর পার হয়ে হাঁটাপথে প্রায় ৩ মাইল (৪'৮ কি.মি.) পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত কাঙ্গপাট গ্রাম (জে.এল.নং ৪৮)। স্থানীয় সিংহরায় পরিবারের গৃহদেবতা রঘুনাথজীউর দালান-মন্দিরটি এখানকার এক উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। রঘুনাথজীউর শালগ্রামমূর্তি ছাড়াও শীতলা এবং মনসামূর্তিও সেখানে উপাসিত। দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের সম্মুখভাগে পঙ্খের নকাশি অলংকরণের মধ্যে টিয়াপাখির সমাবেশ খুবই চিত্তাকর্ষক। মন্দিরটিতে কোন লিপিফলক নেই তবে ১২০৯ বঙ্গাব্দের জমিদারী তায়দাদে এই দেবতা ও মন্দিরের উল্লেখ থাকায় এবং পারিবারিক শ্রুতি অনুসারে সাত পুরুষ আগেকার বক্তার সিংহরায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। এটির

দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৬' ৬" (৫ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ১৫' (৪.৬ মি.)। ফাল্গুন মাসে রঘুনাথজীউর চাঁচর ও দোল উৎসব হয়ে থাকে। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত গ্রামের ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন বিশেষ জনপ্রিয়।

এ ছাড়া ১২৮৪ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় গোপালজীউর বৈষ্ণব মঠে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বিগ্রহ গোপাল, কানাই ও রাধারানীর দারুমূর্তিগুলি সেকালের শিল্পভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতে পারে।

কাষ্ঠসাংড়া : হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুন্সীরহাট হয়ে নিয়মিত বাস চলে) রামচন্দ্রপুর-কুরিট স্টপেজ থেকে উত্তরমুখী কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ মাইল (৩.২ কি.মি) দূরে আমতা থানার অন্তর্গত কাষ্ঠ-সাংড়া গ্রাম (জে.এল.নং ২০১)। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রকাশ, এ দেবালয়ের আদি প্রতিষ্ঠাত্রী ভূরশুট-রাজবংশের রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী 'রায় বাঘিনী' রানী ভবশঙ্করী। একদা ওড়িশার পাঠান সর্দার ওসমান খাঁকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করায় দিল্লীর বাদশাহ্ আকবর তাঁর বীরত্বের জন্য তাঁকে 'রায় বাঘিনী' উপাধি দেন। কালক্রমে প্রথম মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, স্থানীয় দলুই পরিবারের জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি রুদ্রেশ্বর শিবের বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী এই আটচালা মন্দিরটির সম্মুখভাগে আগে পোড়ামাটির সামান্য কিছু অলংকরণ ছিল। কিন্তু সংস্কারের দৌলতে বর্তমানে তা নিশ্চিহ্ন। স্থানীয় জনশ্রুতি, এ দেবালয়ে উৎকীর্ণ লিপিফলকটিও সংস্কারের সময়ে নষ্ট হয়। গঠন-স্থাপত্যের নিরিখে এটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। পশ্চিম দিকে আরও একটি প্রবেশপথযুক্ত এ মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৫' (৪.৬ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। রুদ্রেশ্বর শিবের প্রধান উৎসব চৈত্রসংক্রান্তির গাজন এবং ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রি।

কুমারপুর : 'ইছাপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঁচা রাস্তায় ইছাপুরের ½ মাইল (০·৮ কি.মি.) দক্ষিণে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত কুমারপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৬০)। ধাড়ী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি রাসমঞ্চ এখানকার দ্রষ্টব্য পুরাকীর্তি। আটকোণা রাসমঞ্চটির প্রতি কোণে, উপর-নীচে দুই সারিতে, প্রায় ২½' (৭৬ সে. মি.) উচ্চতার পোড়ামাটির বিভিন্ন নিরেট মূর্তি নিবদ্ধ আছে।

শিব, রাধিকা, কৃষ্ণ, নিতাই, গৌর ও বুদ্ধ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও আছে জপমালা-হাতে সাধু, বল্লমধারী দ্বারপাল, ছত্রধারী নারী ও স্তন্য-দানরত জননী। বেহালা, বীণা, ডুগডুগি, ঘন্টা, ঝাঁঝ, এবং বাঁশি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রবাদিকার মূর্তিগুলিও খুব সুন্দর। ইমারতটির দেওয়ালে পঙ্খের কিছু নকাশি অলংকরণও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ রাসমঞ্চটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়।

পোড়ামাটির বৃহদাকার, নিরেট মূর্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ জাতীয় 'টেরাকোটা'-অলংকরণ একদা হাওড়া জেলা, হুগলী জেলার দক্ষিণ অঞ্চল ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশের কোন কোন স্থানে প্রচলিত ছিল। নিরেট মূর্তিগুলিকে সাধারণতঃ তিন বা চার অংশে বিভক্ত করে ভাটিতে পোড়ানো হত। মাথা ও গলার যুক্ত অংশের নীচের দিকটি ইংরেজী 'V' অক্ষরের মত ছুঁচালো থাকত এবং তা খাপে খাপে গিয়ে বসত। ধড়ের নিম্নাংশে একই মাপের খাঁজকাটা অংশের ভিতর কোমর বা হাঁটুর কাছেও জোড় লাগানো হত অনুরূপভাবে। এই রীতিতে প্রস্তুত ও শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত প্রায় ৩' (৯২ সে.মি.) উচ্চতার একটি অভগ্ন ও অপূর্ব বেহালাবাদিকার মূর্তি বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে।

কুরচি : হাওড়া-উদয়নারায়ণপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) উদয়নারায়ণপুর থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) উত্তরে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত কুরচি-বিনোদবাটি মৌজাভুক্ত কুরচি গ্রাম (জে. এল. নং ১৫)। এখানকার পালপাড়ায় পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পূবমুখী একটি 'একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির স্থানীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এটির প্রবেশপথের উপরে ইতস্ততঃ কয়েকটি পোড়ামাটির পদ্মফুল দেখা যায়। 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ তিন পঙ্ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "শুভমস্তু সকা/ বদা ১৭১৯ সক/ সন ১২০৪ সাল।" মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৯' ৯' (২.৯ মি.) এবং উচ্চতা আনুমানিক ১৫' (৪.৬ মি.)।

গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দিরটি পুরাকীর্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও, 'খেমপুর' নিবন্ধে আলোচিত এই অঞ্চলের কারিগরদের তৈরি মন্দিরগুলির বিশিষ্টতার নিদর্শন।

কুলিয়া : বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-মানকুর বাসপথে মানকুরঘাটে পৌঁছে, সেখান থেকে মোটর লঞ্চ বা নৌকাযোগে ভাটোরা হয়ে আমতা থানার অন্তর্গত কুলিয়া গ্রামে (জে.এল.নং ৮৫) যাওয়া যায়। স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের গৃহদেবতা রাধাশ্যামজীউর মন্দিরের স্থাপত্য অভিনিবেশযোগ্য। এখানে চারিদিকে খোলা বারান্দাসমেত এক দালান-মন্দিরের উপর একটি উত্তরমুখী নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে—যার উত্তর ও পূর্ব দিকের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে পঙ্খের কাজ করা ছোটবড় নানান দেবদেবীমূর্তি। পশ্চিমের দেওয়ালে নিবদ্ধ বারো পঙ্‌ক্তির ছন্দোবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী৺রাধাশ্যামসুন্দরজীউ / রাজীব চরণে / উৎসৃষ্টপ্রাণ আশ্রয়-ভিখারী / জীবন মরণে / শিবপ্রসাদাত্মজ / শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চতুর্ধরী / করিলা প্রতিষ্ঠা সহধর্ম্মপত্নী উজ্জলাসুন্দরী। / বরষ ব্যাপিয়া বিরচি / মন্দির এই অতি অনুপম / তের শত ছত্রিশের / কার্ত্তিকের দিবসে প্রথম ॥ / কুলিয়া।" লিপিফলক অনুসারে পুরাকীর্তি বলে গণ্য না হলেও, স্থানীয় প্রবীণদের মতে, খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি একই পরিবারের ৺দুর্গাদাস চৌধুরীর আমলে নির্মিত আদি মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অবিনাশবাবু আমতা থানার অন্তর্গত বেতাই গ্রামের মন্দির-স্থপতি বিনোদবিহারী চন্দ্রকে আনিয়ে সংস্কারের সঙ্গে এই নবরত্ন মন্দিরটি নির্মাণ করান।

ক্ষীরিশবেড়িয়া : বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-শিবগঞ্জ বাসপথে মোল্লারহাটের ½ মাইল (০.৪ কি মি.) দক্ষিণে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত ক্ষীরিশবেড়িয়া গ্রাম (জে.এল.নং ৯৯)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি স্বয়ম্ভুনাথ শিবের একটি ইটের চারচালা মন্দির। অলিন্দবিহীন মন্দিরটির প্রধান প্রবেশপথ পশ্চিমমুখী হলেও দক্ষিণে আর একটি দরজা আছে। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, যথাক্রমে, ১৬'(৪.৯ মি.), ১৪½' (৪.৫ মি.) ও আনুমানিক ৩৫' (১০.৭ মি.)। কোন লিপিফলক নেই; তবে স্থাপত্যশৈলীর নিরিখে এটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

মন্দিরটির সামনের চাতালে 'খোণ্ডালিট' পাথরে নির্মিত উৎকলীয় ভাস্কর্যের একটি ২½' (৭৬ সে.মি.) দৈর্ঘ্যের বৃষমূর্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন, বহুকাল যাবৎ ধান কাটার সময় ওড়িশা থেকে অনেক লোক এসে এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ান। পুরীর

জগন্নাথের নামে প্রধানতঃ ভিক্ষা চাওয়া হলেও স্থানীয় স্বয়ম্ভুনাথ শিবের নামেও কিছু কিছু আদায় হয় এবং দেশে ফেরার সময় সংগৃহীত অর্থ থেকে তাঁরা স্বয়ম্ভুনাথের পূজা দেন। এইভাবে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, বুদ্ধমূর্তিটি ওড়িশা থেকে তৈরি করে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

খড়িয়প : 'অমরাগড়ি' নিবন্ধে আমতার পশ্চিমে, দামোদরের অপর তীরে, বেতাই-বন্দরে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমতা-ঝিখিরা বাসপথে ২ মাইল (৩.২ কি.মি.) পশ্চিমে আমতা থানার অন্তর্গত খড়িয়প গ্রাম (জে.এল. নং ১২০)। দীর্ঘাঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত স্বয়ম্ভূ খড়েশ্বর শিবের ইটের আটচালা মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। পশ্চিমমুখী এ দেবালয়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৯'৪" (৫.৯ মি.) এবং উচ্চতা আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.)। পোড়ামাটির বড় আকারের ছ একটি পদ্মফুল ছাড়া অলিন্দবিহীন, একদুয়ারী এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে অন্য কোন অলংকরণ নেই। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপরে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রীখড়েশ্বর শিব / শুভমস্তু : / সকাব্দার / ১৬০৩ / শ্রীহরিদাস কর্ম্মকার / প্রতিষ্ঠিত।" মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার নাম লিপিফলকে উল্লিখিত থাকলেও, ১৩২১ সালে প্রকাশিত হরিদাস কাব্যস্মৃতিতীর্থকৃত স্থানীয় ইতিহাসমূলক পুস্তিকা 'খড়ি-অপ বার্ত্তা'য় বলা হয়েছে "·········শিবমন্দির কাহার দ্বারা নির্মিত তাহা কেহই যথাযথ বলিতে পারেন নাই।" সেজন্য হরিদাস কর্মকারের নাম বিকৃত করে ঐ পুস্তিকায় প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ দেওয়া হয়েছে—"শ্রীনমঃ শিবায় / শকাব্দা / ১৬০৩ / শ্রীহরি কর্ম।" অর্থাৎ, হরিদাস কর্মকারের নয়, এটি শ্রীহরির (ভগবানের) কর্ম। পক্ষান্তরে, স্থানীয় কিংবদন্তী, শিবমন্দিরটি জনৈক 'ফিঙ্গা রাজা' বা 'ভৃঙ্গরাজ' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বাগনান থানার অন্তর্গত মেল্লক গ্রামনিবাসী ভূস্বামী মুকুন্দপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্তৃক (খড়িয়প তাঁর জমিদারিভুক্ত ছিল) পরবর্তীকালে পুনর্নির্মিত। মন্দিরের সামনের রোয়াকে ১'২" (৩৬ সে.মি.) উচু ও ১'১১" (৫৯সে.মি.) চওড়া পাথরের একটি গণেশমূর্তি এবং পাথরের একটি দ্বারপার্শ্ব পড়ে থাকতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ, স্থানীয় কোন লুপ্ত মন্দির থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

মন্দিরটির পুব দিকে 'ফিঙ্গা দীঘি' নামে পরিচিত এক বড় দীঘির তীরে কয়েকটি ৭'/৮' (২.১মি./২.৪মি.) উঁচু ঢিপিকে সাধারণ লোকে 'ফিঙ্গে রাজা'র বা 'ভৃঙ্গরাজা'র গড় বলে থাকেন। জনশ্রুতি, উক্ত রাজা জাতিতে কোচ (তিওর) (মতান্তরে, বাগ্রক্ষত্রিয়) ছিলেন। দীঘিটি নাকি

তিনিই খনন করেন এবং ঢিপিগুলি নাকি তাঁরই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। গ্রামবাসীদের অপটু খননের ফলে ঢিপিগুলি থেকে মাঝেমধ্যে পাতলা ইট পাওয়া গিয়েছে।

খালনা : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশনে নেমে, বাগনান-খালনা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস-ট্যাক্সি চলে) ৬ মাইল (৯.৭ কি.মি.) উত্তরে, আমতা থানার এলাকাধীন পূর্ব-খালনা (জে.এল. নং ১৪) এবং পশ্চিম-খালনা (জে. এল. নং ১৬) মৌজাভুক্ত খালনা গ্রাম। স্থানীয় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণরায়-তলায় কৃষ্ণরায়জীউর মন্দিরটিই প্রাচীনতম। এ পরিবারে রক্ষিত এক কুরচিনামায় মন্দিরগুলির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোচন রায় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে: "জেলা হুগলী সবডিভিজন উলুবেড়িয়ার অধীন আমতা থানার অন্তর্গত পরগণে বায়ড়া লাট বারুইপাড়াস্থিত মৌজা বারুইপাড়া গ্রামের শ্রীশ্রী৺খুদীরায় ও শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায়জীউ দেবতাগণের আদি প্রতিষ্ঠাতা ৺ত্রিলোচন রায়—সাকিম নিজ।··· শ্রীশ্রী৺খটেশ্বর ও দামোদরজীউগণেরও মালিক ইহারা হইতেছেন।" উল্লিখিত বারুইপাড়া পরবর্তীকালে বৃহত্তর খালনা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণরায়জীউ মন্দিরটি ইটের, দক্ষিণমুখী আটচালা। দৈর্ঘ্য ১৭´ ৪" (৫.৩ মি.), প্রস্থ ১৭´ ২" (৫.২ মি.) ও উচ্চতা আনুমানিক ২৫´ (৭.৬ মি.)। সামনের ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা ও গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। বন্যার প্রকোপে প্রধান প্রবেশপথটি দেওয়াল তুলে বন্ধ করে পুব দিকে, বেশ উঁচুতে, আর একটি দরজা করা হয়েছে। সম্মুখভাগে একদা রামায়ণ-কাহিনীর 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ ছিল, কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় তা এখন সিমেন্ট-বালির পলস্তারালেপিত। কিন্তু বাঁকানো কার্নিসের নীচ বরাবর দশাবতারের ফলকগুলি রক্ষা পেয়েছে। পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপিটি সংক্ষিপ্ত: "শুভমস্তু শকাব্দা ১৬০৭।" খ্রীষ্টীয় ১৬৮৫ সালে নির্মিত এ দেবালয়টি হাওড়া জেলার সুপ্রাচীন মন্দিরগুলির অন্যতম। কুরচিনামায় উল্লিখিত 'খুদীরায়' (শালগ্রাম) কুদিরায়তলায় দক্ষিণমুখী এক সাধারণ দালান-মন্দিরে অধিষ্ঠিত: সামনের প্রাঙ্গণে ছয়কোণা যে দুটি রাসমঞ্চ আছে তা কুদিরায় ও কৃষ্ণরায়জীউর বাৎসরিক উৎসবের জন্য ব্যবহৃত হয়।

খটেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী, আটচালা মন্দিরটি গ্রামের বারুইপাড়ায় অবস্থিত। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ দুই পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটির

পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীত্রৈলক্যপ্রসাদ রায়/শ্রীখটেশ্বর শুভমস্তু সকাব্দা ১৭৮৩ সক।" ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত অলংকরণবিহীন এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। পশ্চিমপাড়ায় রায় পরিবারের দামোদরজীউর দালান-মন্দিরটি পোড়ামাটির মূর্তি ও নকাশি ভাস্কর্যে অলংকৃত। ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরিভাগে অনুভূমিক দু সারি এবং দু পাশে খাড়াভাবে এক সারি ফলক নিবদ্ধ। ফুলঙ্গির মধ্যস্থিত মূর্তিগুলির চারপাশে সূক্ষ্ম নকাশি-কাজের বেষ্টনী। বিষয়বস্তু—কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, বিভিন্ন ভঙ্গিতে মহন্ত, শিশুক্রোড়ে রমণী, ব্যজনহস্তে নারী, কলসী-কাঁখে বধূ, নর্তকী, কুস্তিগীর, মৈথুনরত নরনারী, বন্দুকধারী সাহেব প্রভৃতি। এ দেবালয়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও উচ্চতা, যথাক্রমে, ২১´ ৪˝ (৬.৫ মি.) ও আনুমানিক ১৩´ (৪ মি.)। গর্ভগৃহ ও সামনের দালানের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা নির্মিত।

খালনা বাজারের কাছে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে নির্মিত ধর্মরাজের পূর্বমুখী দালান-মন্দির, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে স্থাপিত জলেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির এবং জয়চণ্ডীর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির পুরাকীর্তি না হলেও দর্শনযোগ্য।

পূর্বপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দামোদরজীউর নবরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও সেটির অলংকরণে ব্যবহৃত দু একটি 'টেরাকোটা'-ফলক বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে।

পশ্চিম-খালনা মৌজাভুক্ত পশ্চিমপাড়ায় খাঁ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন্দের দক্ষিণমুখী, পঞ্চরথ, শিখর-দেউলটি মাত্র ষাট বছর আগে স্থাপিত হলেও অদূরের ঝিখিরা গ্রামের স্থপতিদের কীর্তি হিসাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ দেবালয়ের ছাদ কুব্জপৃষ্ঠ খিলান দ্বারা নির্মিত। ভিতরের দেওয়ালের গায়ে চুনবালির কাঠামোর উপর পঙ্কের প্রলেপযুক্ত বেশ কিছু দেবদেবীমূর্তিও উৎকীর্ণ আছে।

খালোড়: বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর বাসপথে ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) দক্ষিণে, বাগনান থানার অন্তর্গত খালোড় গ্রাম (জে. এল. নং ৭৪)। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এ গ্রামের নাম সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্ভুক্ত 'খাড়োড়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় দু শ বছরের পুরাতন দলিলপত্রাদিতেও খালোড় পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পিচের রাস্তার সংলগ্ন এক দক্ষিণমুখী দালান-মন্দিরে

অধিষ্ঠিতা প্রায় ৮´ (২.৪ মি.) উচ্চতার কাঠের মহাকালীমূর্তিটি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। কিংবদন্তী অনুসারে, খালোড় পরগনার ভূতপূর্ব ভূস্বামী জনৈক রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় প্রায় চার শ বছর আগে নাকি দেবীর মৃন্ময়ীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও, প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত স্থানীয় ইতিহাসমূলক পুস্তক 'সংক্ষিপ্ত পল্লীচিত্র'তে লেখা হয়েছে—"খালড় পরগণা প্রথমতঃ খালড় গ্রামস্থ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের জমিদারী হইয়াছিল; ঐ কন্দর্পনারায়ণই খালড় গ্রামস্থ ৺দক্ষিণা কালিকা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। উহার নিকট হইতে খালড় পরগণা সাওড়াফুলীর রাজার অধিকারে গিয়াছিল। পরিশেষে উহা ত্রিবেণী-বাসবেড়্যার সিংহ মহাশয়দিগের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে।" বর্তমান কাঠের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। জনশ্রুতি, শ্যামপুর গ্রামের সংলগ্ন দক্ষিণ-শ্যামপুর গ্রামের মাহিষ্য জাতীয় কাঠের কারিগর জনৈক গণেশচন্দ্র মণ্ডল দেবীর স্বপ্নাদেশে তাঁর এই বিরাট মূর্তিটি নির্মাণ করেন।

মহাকালী মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণে, প্রশস্ত নাটমণ্ডপের পাশে, পুব ও পশ্চিমমুখী দুটি ছোট আটচালা মন্দিরে দেবীর ভৈরব বাণলিঙ্গ ও মৃত্যুঞ্জয় শিব প্রতিষ্ঠিত। শেষোক্ত শিবলিঙ্গটির অবস্থান এক কুণ্ডমধ্যে যেখানে গাজন উৎসবের সময় 'বাণফোঁড়া' অনুষ্ঠান পালনের জন্য বেশ কয়েকটি লোহার শিক রক্ষিত। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মত 'জিহ্বাবাণ' প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক প্রথা এখানে অপ্রচলিত। এখানে শুধু পাঁজরের চামড়া বাণবিদ্ধ করা হয়।

মহাকালী মন্দিরের পশ্চিমে, রাস্তার ওপারে, টালি-ছাওয়া এক দালান-মন্দিরে বহু কূর্মমূর্তি ধর্মদেবতা রক্ষিত আছেন। পাল-পরবর্তী যুগের, কষ্টিপাথরের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বিষ্ণুমূর্তিও এখানে ধর্মরূপে উপাসিত। কাছেপিঠের ধর্ম-উপাসকেরা সেবাপূজা চালানোয় অপারগ হয়ে তাঁদের মূর্তিগুলি এ মন্দিরে রেখে গেছেন বলে এখানে তাঁদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে।

গ্রামের বসুপাড়ায় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বসু পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী, আটচালা মন্দিরের সম্মুখ-ভাগ এখন ভগ্ন হলেও, গর্ভগৃহের প্রবেশপথের দেওয়ালে ফুল-লতা-পাতার অলংকরণযুক্ত যেসব পোড়ামাটির ফলক বর্তমান, তা দেখে মনে হয় এ দেবালয়টি একদা 'টেরাকোটা'-সজ্জায় সমৃদ্ধ ছিল। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

খেমপুর : হাওড়া-উদয়নারায়ণপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) উদয়নারায়ণপুর থেকে কাঁচা রাস্তায় ৪ মাইল উত্তরে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত খেমপুর গ্রাম (জে.এল. নং ১০)। এখানকার পূর্বপাড়ায় শান্তিনাথ শিবের দক্ষিণমুখী একটি একদুয়ারী, আটচালা মন্দির উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। সেটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১০'৬" (৩.৩ মি.) প্রস্থে ১০' (৩.১ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের সম্মুখভাগে আদি প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, প্রবেশপথের ডান দিকের দেওয়ালে মন্দিরসংস্কারের সময় ক্ষোদিত লিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রী শ্রী৺শান্তিনাথ শিবঠাকুরের মন্দির। / নির্মাণ সন ১২৬০ সাল তাং ২৬ অগ্রহায়ণ / খেমপুর নিবাসী ৺ধরণীধর বেরার স্ত্রী শ্রীবসন / বালা বেরা কর্তৃক দেবমন্দির সংস্কার করা / হইল। সন ১৩৫৪ সাল তাং ২৮ আশ্বিন।" অতএব, এ মন্দিরটি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় শীতলা-মনসার যে পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি আছে তা উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে নির্মিত হলেও, মন্দিরের সামনের দেওয়ালে চুনবালির পলস্তারার উপর উৎকীর্ণ লিপিফলকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই দেবগৃহ নির্মাণে যে স্থপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন এই গ্রামেরই অধিবাসী। স্থাপত্যের দিক থেকে শান্তিনাথ শিবের এ মন্দির ও পার্শ্ববর্তী কুরচি গ্রামের আটচালা মন্দিরের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এসব মন্দিরে উপরের অতি ক্ষীণকায় চারচালাগুলি এ অঞ্চলের কারিগরদের এক বিশেষ নির্মাণরীতির পরিচয় বহন করে। আলোচ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রীশিতল চন্দ্র মাইতি সাং সিতাপুর / শ্রীগোকুল মিস্তিরি সাং খেমপুর / সন ১৩০০ সাল।" মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত এবং এটির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৯'৮" (২.৯ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ১৮' (৫.৫ মি.)।

গজা : 'উদয়নারায়ণপুর' নিবন্ধে উদয়নারায়ণপুর পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত গজা গ্রাম (জে. এল. নং ৭)। স্থানীয় কোলে পরিবারের দামোদরজীউর (শালগ্রাম) নবরত্ন মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। সেটির প্রবেশপথের উপরিভাগে পোড়ামাটির ফলকে লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য এবং উল্লম্ব ও অনুভূমিকভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে ফুল-লতা-পাতা ও প্রস্ফুটিত পদ্মের অলংকরণ। প্রবেশপথের

দু ধারে দুটি 'টেরাকোটা'-দ্বারপালের মূর্তি দেখা যায়। সামনের বাঁকানো কার্নিসের নীচে দুটি আলাদা ফলকে ক্ষোদিত প্রতিষ্ঠালিপি একত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাঁ দিকের প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "৭ শ্রী শ্রীরাম-চন্দ্রায় নমঃ / শুভমস্তু (শ) কাব্দা ১৭১০।" মন্দিরটি অতএব ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ডান দিকের ফলকটির পাঠ—"শ্রী শ্রী ৺ দামুদর ঠাকুর :— / নায়ক শ্রীরামকান্ত দাস কল্যা / কারিকর শ্রীরামকান্ত মিস্ত্রী।" প্রতিষ্ঠাতার পদবী হিসাবে যে 'কল্যা' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তা 'কোলে' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্তীকালে। পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলায় কিন্তু এখনও 'কল্যা' পদবীটি অপ্রচলিত নয়। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী হলেও পশ্চিম দিকে আর একটি প্রবেশপথ আছে। দ্বিতলে ওঠার জন্য সিঁড়ির প্রয়োজনে উত্তর ও পশ্চিমে যে কুঠরি নির্মিত হয়েছে, তাদের ছাদ টানা-খিলানের উপর স্থাপিত এবং পুব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে পাশ-খিলানযুক্ত গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৫' ৬" (৪৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.)। বিগ্রহ বর্তমানে দ্বিতলে রক্ষিত।

গ্রামের মাঝপাড়ায় গজাইচণ্ডীতলায় দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী আর একটি আটচালা শিবমন্দিরের সম্মুখভাগে, বাঁকানো চালের নীচে, 'টেরাকোটা'-লিপিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীসিব ঠাকুর। যুভমস্তু সকাব্দা ১৭১৭ সন ১২০২ সাল / লাএক। শ্রীকৃষ্ণ কাড়ার। মীস্ত্রী শ্রীমানিকরাম দাস / মাহ ১২ আ ……১২ রোজ বুধবার ইতি। :।" কোলে পরিবারের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠার সাত বৎসর পরে (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের লিপিতেও, কারিগরের নাম উল্লিখিত হলেও তাঁদের নিবাস সম্পর্কে কিছু জানবার উপায় নেই। আলোচ্য মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত এবং এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' ৮" (৪.২ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)।

গণেশপুর : 'উলুবেড়িয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া-গড়চুম্বক (স্থানীয় কথ্য ভাষায় 'গড়চুমুক') পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গড়চুম্বক পৌঁছে, দামোদর নদ পার হয়ে, কাঁচা রাস্তায় ২½ মাইল (৪ কি.মি.) দক্ষিণে কিংবা হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথে বাগনান স্টেশনে নেমে বাগনান-শিবগঞ্জ-কমলপুর পিচের সড়কে (বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিয়মিত বাস চলে)

শশাটিতে নেমে, পুব দিকে কাঁচা রাস্তায় ৫ মাইল (৮.১ কি.মি.) দূরে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত গণেশপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৭৬)। এখানকার জমিদার চৈতন্যচরণ রায় প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের (শালগ্রাম) পুবমুখী, নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ দেবালয়ের ত্রিখিলান অলিন্দের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার খিলানের দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজের দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১' (৬.৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৪০' (১২.২ মি.), এ মন্দিরের সামনের বাঁকানো কার্নিসের নীচে পোড়ামাটির ফলকে ছ পঙ্‌ক্তির নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠালিপিটি উৎকীর্ণ আছে: "শ্রীশ্রীরামচন্দ্র। সুভমস্তু সকাবদ্দা ১৭৪২ সক। সন ১২২৭ সাল। তাং ৯ বৈসাখ পুস্যা নক্ষত্র ॥ / বৃহস্পতিবার য়ারম্ভ কিত্তি শ্রীচৈতন্যচরণ রায়। গঠনাথ শ্রীরামপ্রসাদ চন্দ্র মিস্ত্রিরী সাং রাঔতড়া।" ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরের স্থপতি রামপ্রসাদ চন্দ্র ছ বছর পরে কল্যাণপুর গ্রামের কালীমন্দির নির্মাণে অংশগ্রহণ করায় উভয়ক্ষেত্রে পঙ্খের অলংকরণের প্রকৃত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। পঙ্খ-সজ্জা ছাড়াও সামনের বাঁকানো কার্নিসের নীচ বরাবর ছ সারি এবং ছ পাশে খাড়াভাবে এক সারি করে কুলঙ্গিতে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ভাস্কর্যফলক স্থাপিত হয়েছে। বিষয়বস্তু—দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক দেবদেবী। পোড়ামাটি ও পঙ্খ-সজ্জার যুগপৎ প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, মন্দিরটি সেই যুগে নির্মিত যখন মন্দির-'টেরাকোটা'শিল্পের অবনতির সুযোগে পঙ্খের অলংকরণ ধীরে ধীরে তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল।

গড়চুমক : 'গণেশপুর' নিবন্ধে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত গড়চুমকে (জে. এল. নং ৪৮) পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কথ্য ভাষায় এ পল্লীর নাম 'গড়চুমুক'। গ্রামের বড়বাড়ি এলাকায়, 'সুজন দীঘি'র দক্ষিণ পাড়ে, জঙ্গলাকীর্ণ এক ভগ্ন মসজিদ ও শাহ্ সুজন পীরের মাজার দেখা যায়। ভগ্ন মসজিদের ছ একটি পাথরের স্তম্ভ কাছেই পড়ে আছে। স্থানীয় রায় পরিবারের পুষ্করিণী খননকালে এবং অদূরের দামোদর নদের সংস্কারের সময় এখানে বহু ইটের দেওয়াল ও কিছু ধূসর রঙের মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। ইটগুলির মাপ ৮"×৭½"×২" (২০×১৯×৫ সে. মি.)। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণে মনে হয়, এখানে মোসলেম-পূর্ব যুগে এক প্রাচীন বসতি ছিল।

উল্লিখিত দীঘি, মসজিদ ও মাজার সম্বন্ধে স্থানীয় লোকসমাজে নানান কিংবদন্তী প্রচলিত। শাহ্জাহানের আমলে এ গ্রামে নাকি

নূর খাঁ নামে জনৈক সামন্ত-নৃপতির বসবাস ছিল। শাহ্ সুজন পীরের অলৌকিক শক্তির কথা শুনে তিনি তাঁকে নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। পীরের অনুরোধে নূর খাঁ একটি মসজিদ নির্মাণ ও সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য একটি দীঘি খনন করিয়ে দেন। সুজন পীর নাকি রাতারাতি মক্কা থেকে দু কুঁজো পবিত্র জল এনে একটি দীঘিতে ঢেলে দেন ও অন্যটি রাখেন মসজিদে। এ দিকে খাজনা বাকী পড়ায়, বাদশাহ্ হুকুম করেন নূর খাঁকে বলতে হবে, —"বাদশাহ্ কা কড়ি, নূর খাঁকা নাম"। কিন্তু নূর খাঁ ভুল করে বলেন—"নূর খাঁকা কড়ি বাদশাহ্ কা নাম।" কুপিত সম্রাটের আদেশে অপরাধীর শিরশ্ছেদ হলেও কাটা মুণ্ড নাকি ওই একই কথা বলতে থাকে। সুজন পীর মসজিদ থেকে মক্কার জলভরা কুঁজো নিয়ে নূর খাঁর কাটা মুণ্ড জোড়া দেবার জন্য রওনা হলে বাদশাহের লোকেরা তাকে বাধা দেয় ও উপহাস করে। রুষ্ট পীর পথের পাশে এক বলিপ্রদত্ত মহিষের গলায় কুঁজোর জল ঢেলে দিতেই মহিষটি জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, হায়, পীর সাহেব রোষবশে সব জলটুকু এভাবে খরচ করে ফেলায় নূর খাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সুজন দীঘি, সুজন পীরের মাজার ও তাঁরই অনুরোধে প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন মসজিদটি এখনও এ কিংবদন্তীর স্মৃতি বহন করছে।

গড়বালিয়া: 'ইছাপুর' নিবন্ধে 'নিজবালিয়া' পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) পশ্চিমে নিজবালিয়া মৌজার (জে. এল. নং ৪৬) পশ্চিম অংশের গ্রাম গড়বালিয়া। এখানকার শিবতলায় ইটের, পশ্চিমমুখী, দালানবিহীন একটি সাধারণ আটচালা মন্দিরে গ্রামদেবতা 'বুড়োশিব' অধিষ্ঠিত। প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ তিন পঙ্ক্তির প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীরাম শুভমস্তুষ / কাব্দা ১৭০৯। / সন ১১৯৪ শাল।" দেবালয়টি, অতএব, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১৩' ১০" (৪. ৩ মি.), প্রস্থে ১২' ৩" (৩. ৮ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬. ১ মি.), এ মন্দিরের আয়তাকার গর্ভগৃহ পাশ-খিলান দ্বারা বর্গাকার করে, গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

এ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে, মান্না পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর শিবের ইটের, পুবমুখী আর একটি দালানবিহীন আটচালা মন্দির আছে। প্রবেশপথের দু পাশে দুটি পোড়ামাটির দ্বারপালমূর্তি ছাড়া আর কোন

বিশেষত্ব নেই। দৈর্ঘ্যে ১০′ ৪″ (৩.২ মি.), প্রস্থে ৯′ ১১″ (৩ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ১৫′ (৪.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদের গড়ন পূর্বোক্ত 'বুড়োশিব' মন্দিরের অনুরূপ। কোন লিপিফলক নেই। গঠন-স্থাপত্য অনুসারে এটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়। দ্বিতীয় মন্দিরটির দক্ষিণ পাশে অবস্থিত রাসমঞ্চের ৪′ (১.২ মি.) উঁচু ভিত্তির গায়ে ২′ (৬১ সে. মি.) উচ্চতার কয়েকটি পোড়ামাটির দ্বারপাল, সাহেব ও নগ্ন নারীমূর্তি সংস্থাপন করা হয়েছে।

মহাপ্রভুতলায় এক দালান-মন্দিরে (আনুমানিক, খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষভাগে নির্মিত) গৌরনিতাই-এর ৪′ (১.২ মি.) উচ্চতার যে দুটি নিম কাঠের মূর্তি আছে তা সমকালীন কাঠখোদাই শিল্পের মূল্যবান্ নিদর্শন।

গড়ভবানীপুর : 'অমরাগড়ি' নিবন্ধে বেতাই-বন্দরে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমতা-গড়ভবানীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত ট্যাক্সি-বাস চলে) প্রায় ৭ মাইল (১১.৩ কি.মি.) উত্তর-পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত গড়ভবানীপুর গ্রাম (জে.এল. নং ৫৩)। গ্রামের হাট এলাকার কাছে দশনামী সম্প্রদায়ের মণিনাথ শিবের প্রাকারবেষ্টিত, পশ্চিমমুখী, আটচালা মন্দিরটি এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। একাধিকবার সংস্কারের ফলে এ দেবালয়ের সাবেক 'টেরাকোটা'-টালির অধিকাংশ নষ্ট হলেও সামনের বাঁকানো কার্নিসের নীচে অনেকগুলি পোড়ামাটির পদ্ম ও প্রবেশতোরণের গায়ে কিছু মূর্তি-ভাস্কর্য নিবদ্ধ দেখা যায়। সামনের দেওয়ালে, ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে, পরবর্তীকালে কয়েকটি চুনবালির মূর্তি সংযোজিত হয়েছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৬′ (৪.৯ মি.), প্রস্থে ১৫′ ৮″ (৪.৮ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.)। তারকেশ্বরের মূল মঠের অধীনে, দশনামী শৈব-সম্প্রদায়ের শাখা-কেন্দ্র হিসাবে একদা এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পরিচালনার জন্য ভূরশুট রাজবংশ ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বহু নিষ্কর জমি দান করেন। বর্তমানে এটির পরিচালনার ভার স্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে। অনেকে বলেন, গড়ভবানীপুর মঠের প্রতিষ্ঠাতা মণিনাথ গিরি মণিনাথ শিবের এ মন্দিরটির নির্মাতা। কিন্তু অন্যদের মতে, মণিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির উপর ভূরশুট রাজবংশের দেবনারায়ণ বর্তমান দেবালয়টি নির্মাণ করিয়ে দেন। দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা যেহেতু মৃত্যুর পর শিবত্ব প্রাপ্ত হন বলে বিশ্বাস, সেজন্য উপবিষ্ট ভঙ্গিতে তাঁদের কবর দেবার পর

সমাধির উপরে শিবমন্দির, নিদেনপক্ষে শিবলিঙ্গ, প্রতিষ্ঠা করাই চির-প্রচলিত রীতি। আলোচ্য মন্দিরের প্রাঙ্গণে পরবর্তীকালের বহু মহন্তের সমাধির উপর একটি করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। মন্দিরলিপিটির পাঠ: "শ্রীভগবতে নমঃ শুভমস্তু শকাব্দা /দেবনারায়ণ ১৩০৬। ২১ শ্রাবণ।" প্রতিষ্ঠা-বৎসরটি সন্দেহজনক। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন প্রবন্ধে শকাব্দের সালটি ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এটি ১৩০৬ না হয়ে ১৬০৬ শকাব্দ হবে। মনে হয়, সংস্কারের সময় মিস্ত্রীদের ভুল এর কারণ।

মণিনাথ মন্দিরের ¼ মাইল (০.৪ কি.মি.) উত্তর-পূবে, প্রায় ৮′ (২.৪ মি.) উঁচু এক ঢিপির উপর অবস্থিত, সম্পূর্ণ ভগ্ন ও জঙ্গলাবৃত, দক্ষিণমুখী আর একটি দেবালয় নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দৈর্ঘ্যে ৩০′ (৯.২ মি.), প্রস্থে ২০′ (৬.১ মি.) ও বর্তমান উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২.২ মি.), এ দেবালয়টি সম্ভবতঃ বেশ বড় আকারের আটচালা মন্দির ছিল। দক্ষিণ, পুব ও পশ্চিমের ত্রিখিলান দালানের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিমের দুটি ভেঙে পড়েছে। সিঁড়ির চিহ্ন বর্তমান থাকলেও উপর-তলাটি এখন বিধ্বস্ত। পুবের দালানের ছাদ, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের টানা-খিলানের উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। অপর দুটি ভগ্ন অলিন্দের ছাদও সম্ভবতঃ একই প্রকার ছিল। গর্ভগৃহের ছাদের নির্মাণ-প্রকরণ এখন আর জানবার উপায় নেই। জনশ্রুতি, গড়ভবানীপুর-রাজের গৃহদেবতা গোপীনাথজীউ এখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শত্রুহস্তে পরাজয়ের ফলে বিগ্রহ ও মন্দিরের যাবতীয় সামগ্রী নাকি অদূরের 'ফুল পুকুরে' নিক্ষিপ্ত হয়। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত এবং বর্তমানে বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত ভগ্ন প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীহরে........./ শুভমস্তু / সকাব্দা ১৬২৭।" ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই লুপ্তপ্রায় দেবালয়টি হাওড়া জেলার প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম।

গাজীপুর: 'অমরাগড়ি' নিবন্ধে বেতাই-বন্দরে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দামোদরের পশ্চিম তীরের বাঁধ বরাবর কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) দক্ষিণে আমতা থানার অন্তর্গত গাজীপুর গ্রাম। মৌজার নাম কিন্তু পূর্ব গাজীপুর (জে. এল. নং ১৪০)। এখানকার মজুমদারপাড়ায় মজুমদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দরায়-জীউর ইটের, পুবমুখী, দোতলা দালান-মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে বেশ অভিনব। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথমভাগে নির্মিত অনুরূপ

দেবালয় আমতা অঞ্চলে আরও দেখা যায় এবং মনে হয় সে সময় এই রীতির মন্দির সেখানে কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছিল। সামনের ত্রিখিলান দালানের কেন্দ্রীয় খিলানটির শীর্ষে যুদ্ধরত রাম-রাবণের বেশ বড় ও খুব সুন্দর দুটি পৃথক ফলক থেকে মনে হয়, আদিতে পোড়ামাটির সজ্জা হয়ত অনেক বেশী পরিমাণে ছিল। এখন খিলানের দু পাশের দেওয়ালে খাড়াভাবে চারটি করে ও খিলানের উপরে আড়াআড়িভাবে বারোটি মনোরম পদ্ম ফুলঙ্গির মধ্যে উৎকীর্ণ দেখা যায়। এ ছাড়া খিলানগুলির ঢেউকাটা প্রান্ত বরাবর সূক্ষ্ম নকাশি কাজও আছে। মন্দিরের ভিতরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বন্যার সময় বিগ্রহের নিরাপত্তার জন্য নাকি এহেন সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়েছিল। সামনের ত্রিখিলান দালানের ছাদ আদিতে টানা-খিলানের উপর রক্ষিত ছিল কিন্তু বর্তমানে কড়ি-বরগা দিয়ে তা মেরামত করা হয়েছে। অনুরূপ সংস্কার করতে হয়েছে ভিতরের কক্ষটির ক্ষেত্রেও। দৈর্ঘ্যে ২৫′ (৭.৬ মি.) প্রস্থে ২২′ ৩″ (৬৮ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ৩০′ (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ পোড়ামাটির এক পঙ্‌ক্তির লিপির পাঠ: "শুভমস্তু সকাব্দা ১৬৩৬ মাহ অগ্রায়ণ।" প্রতিষ্ঠাকাল, অতএব, ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ হওয়ায় এটি হাওড়া জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে বেশ প্রাচীন। কিন্তু এটির নির্মাণের পূর্বে বিগ্রহ নাকি কাছেই আর একটি জোড়বাংলা মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন সেটি লুপ্ত হয়েছে।

এ মন্দিরের ১০০ গজ (৯২ মি.) উত্তর-পুবে একই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমন্দিরটির গর্ভগৃহে এক অনাদিলিঙ্গ শিব থাকা সত্ত্বেও সেটি বর্তমানে ভগ্ন, পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। শিবরাত্রি ও গাজন উৎসবের সময় নাকি কিছুটা পরিষ্কার করে নিয়ে পূজা হয়। পুব দিকের দ্বিতীয় প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ পাঁচ পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীরামঃ / শকাব্দাঃ ১৬/ ১৭ আরম্ভ/সমাপ্ত কর্মী/শ্রীগুরুচরণ দাস।" ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ত্রী গুরুচরণ দাস কর্তৃক নির্মিত এ মন্দিরের দুটি প্রবেশপথের ছাদই ধাপযুক্ত খিলান দ্বারা রক্ষিত এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রথম মন্দিরটি থেকে দ্বিতীয় মন্দিরটি প্রায় ১৯ বছরের পুরাতন এবং হাওড়া জেলার প্রাচীনতম মন্দিরের একটি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪.৬ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.), এ মন্দিরের দক্ষিণ ও পুবের দেওয়াল পোড়ামাটির নকাশি ও মূর্তিফলকে বহুলঅলংকৃত ছিল। এখনও দক্ষিণ দিকে কিছু সুন্দর সজ্জা

ও দশাবতার ফলকের অবশেষ দেখা যায়। কিন্তু সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা।

গ্রামের অন্যত্র আটচালা-রীতির, দক্ষিণমুখী, জোড়া-শিবমন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ: "শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৩১/ মাহ ফাগুন।" মন্দির দুটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দির দুটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮' (২.৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ১৫' (৪.৬ মি.)।

গাদিয়াড়া: বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-শিবগঞ্জ বাসপথে শিবগঞ্জে নেমে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী বাঁধ বরাবর প্রায় ৪ মাইল (৬.৪ কি. মি.) দক্ষিণে শ্যামপুর থানার অন্তর্বর্তী গাদিয়াড়া গ্রাম (জে. এল. নং ১০৪)। পুরাতন দলিলপত্রে এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুরাতন জেলা গেজেটিয়ারে এই স্থানকে 'মাকড়া পাথর' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক নির্মিত 'ফোর্ট মর্নিংটন পয়েন্ট' নামে অভিহিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ। শত্রুর রণতরী প্রভৃতিকে কামানের পাল্লার ভিতরে রাখবার জন্য ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থলে এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লর্ড ক্লাইভ দুর্গটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে দুর্গটি পরিত্যক্ত হওয়ায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বিগত ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে নদীর তীরে ভাঙনের ফলে দুর্গের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ বার হয়ে পড়ে। এখনও ভাটার সময় ইটের লম্বা সুড়ঙ্গপথসহ নিমজ্জিত দুর্গের বিভিন্ন অংশ দেখতে পাওয়া যায়।

গুমাডাঙ্গী: হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মুন্সীরহাটের ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) পশ্চিমে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গুমাডাঙ্গী গ্রাম (জে. এল. নং ৩১)। স্থানীয় 'গুমো' ঠাকুরের নামানুসারে গুমোডাঙ্গা এবং তা থেকে চলতি কথায় গুমাডাঙ্গী। গ্রামের শিবপুকুরতলায় পাশাপাশি দুটি পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী শিবমন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। বাঁ দিকেরটি এক বটগাছের ঝুরিতে আবদ্ধ হয়ে বর্তমানে ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও ডান দিকেরটির অবস্থা কিছু ভাল। এ মন্দিরের প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালে একদা নাকি চার-পাঁচ সারি 'টেরাকোটা'-অলংকরণ ছিল কিন্তু এখন সেগুলি অপহৃত। দুয়ারের দু পাশে এক সারি ফুল-লতা-পাতার নকশা খাড়াভাবে ও উপরে অনুভূমিকভাবে অক্ষত অবস্থায় আছে। ফুলকারি-অলংকরণের

দু পাশে উল্লম্বভাবে চারটি করে মোট আটটি এবং উপরে অনুভূমিকভাবে পাঁচটি প্রস্ফুটিত পদ্মের ফলক এখনও বিদ্যমান। পদ্ম-ফলকের পরে আবার ফুল-লতা-পাতার নকশা দু পাশ বরাবর উঠে উপর দিয়ে ঘুরে এসেছে। পাদমূলে প্রথাগত সামাজিক দৃশ্য-ফলকের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে নানা ধরনের জ্যামিতিক ও ফুলকারি-নকশা। জগৎবল্লভপুর এলাকার আটচালা-রীতির অলংকৃত দেবালয়গুলির তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, বামুনপাড়া, যদুপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির-অলংকরণ গুমাডাঙ্গীর ধরনেই বিন্যস্ত হয়েছে। আলোচ্য মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত এবং এটি দৈর্ঘ্যে ১১′ (৩.৪ মি.), প্রস্থে ৯′ ৬″ (২.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.)।

গ্রামের 'শাল পুকুরে'র পুব পাড়ে স্থানীয় মজুমদার পরিবার একটি পশ্চিমমুখী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র দক্ষিণ দিকের দেওয়ালটি ছাড়া তার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই।

গোগুলপাড়া: হাওড়া-উলুবেড়িয়া বাসপথে ধূলাগড়িতে নেমে, পিচের শাখাপথে ৪ মাইল (৬.৪ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে পাঁচলা থানার অন্তর্গত গোগুলপাড়া গ্রাম (জে. এল. নং ১০)। এখানকার হালদারপাড়ায় হালদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দেবী চণ্ডীর ইটের, দক্ষিণমুখী, জোড়বাংলা মন্দিরটি অভিনিবেশযোগ্য। কেননা, সাধারণভাবে, গোটা পশ্চিমবঙ্গে এবং বিশেষভাবে হাওড়া জেলায়, এই রীতির দেবালয়ের সংখ্যা এখন বেশী নয়। মন্দিরটির ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির ফলকে প্রথাগত রাম-রাবণের যুদ্ধকাহিনী উৎকীর্ণ। অপটু সংস্কারের ফলে এবং পরবর্তীকালের অবহেলায় 'টেরাকোটা'-অলংকরণগুলি ক্রমশঃই নষ্ট হতে চলেছে। সামনের দালানের এবং গর্ভগৃহের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার টানা-খিলানের উপর রক্ষিত। দৈর্ঘ্যে ১৮′ ৯″ (৫.৭ মি.), প্রস্থে ১৮′ ২″ (৫.৫ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০′ (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ দুই পঙ্‌ক্তির পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ: "শকাব্দা ১৬৯০/সন ১১৭৫।" মন্দিরটি, অতএব, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। কিছুকাল আগে, আমাদের পরিদর্শনের সময়, গর্ভগৃহে প্রায় ২′ (৬১ সে. মি.) উচ্চতার একটি কাঠের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়, যেটির গঠনে ও রঙের প্রয়োগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাব খুবই স্পষ্ট। দানস্বরূপ গৃহীত হয়ে মূর্তিটি এখন বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে।

এ মন্দিরের পশ্চিমে ভারতী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ইটের, দক্ষিণমুখী, একটি সাধারণ আটচালা মন্দির দেখা যায়। উপাসিত বিগ্রহ 'চাঁপা রায়' (ঘট-আকৃতির ধর্মঠাকুর) এবং দামোদরজীউ (শালগ্রামশিলা)। জনশ্রুতি, জনৈক জীবিত মহন্তের সমাধির উপর নাকি দেবালয়টি নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১৩' (৪ মি.) প্রস্থে ১১'৪" (৩.৮ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.), এ মন্দিরের অন্যত্র পোড়ামাটির সজ্জা না থাকলেও, উপরের চারচালার খাড়া দেওয়ালের গায়ে বৃষবাহন শিবের একটিমাত্র খুব সুন্দর পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ আছে। সামান্য ক্ষয়িত, তিন পঙ্‌ক্তির পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠাফলকটি নিম্নরূপ: "সু·········স্তু / শকাব্দা ১৭৭৪ / সন ১২৫৯ ২২ আষাড়।" অর্থাৎ, মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে, ভৈরবীতলায়, দেবী ভৈরবীর (শালগ্রামশিলা) একটি ইটের, দক্ষিণমুখী, অলিন্দযুক্ত আটচালা মন্দির আছে। ১৩২৬ এবং ১৩৬১ বঙ্গাব্দে সংস্কারের কালে পূর্ণস্তম্ভ দুটি সিমেন্টের প্রলেপে আবৃত হলেও খিলানশীর্ষে লঙ্কাযুদ্ধের সুন্দর 'টেরাকোটা'-সজ্জা এখনও অক্ষত আছে। দৈর্ঘ্যে ১৬'৮" (৫.১ মি.), প্রস্থে ১৪'২" (৪.৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৩৫' (১০.৭ মি.), এ দেবালয়ের দালানের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার টানা-খিলান ও গর্ভগৃহের ছাদ দুটি পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ তিন পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠা-লিপিটির পাঠ: "ভৈরবীমাতা শুভমস্তু শকাব্দা / সন ১১৬৪ শকাব্দা / ১৬৭৯।" দেবালয়টি, অতএব, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

গোবিন্দপুর: হাওড়া-পানপুর পিচের সড়কে (বর্তমানে জালালসি পর্যন্ত বাস চলে) পূর্বতন মার্টিন রেলপথের মাজু রেল-স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) দক্ষিণে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৬৮)। এখানকার বসুপাড়ায় বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি আংশিক ভগ্ন ও অলংকরণবিহীন হলেও গঠন-প্রকরণের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি, বর্ধমান মহারাজের দেওয়ান হরনারায়ণ বসু প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠালিপিহীন এই শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন। গর্ভগৃহের চারদিকের উত্তর দিক ছাড়া অন্য তিন দিক থেকে ত্রিখিলান প্রবেশপথ আছে যদিও দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রবেশপথগুলি বর্তমানে ভগ্ন। উত্তর দিক টানা-দেওয়াল দিয়ে আবৃত। প্রদক্ষিণ পথের চার কোণে

চারটি ছোট গম্বুজ ছাড়াও অলিন্দগুলির ছাদ ধারণের জন্ম দুই প্রান্তে বড় খিলান ও মধ্যবর্তী লম্বা অংশে টানা-খিলান বা 'ভল্ট'-এর ব্যবহার বেশ অভিনব। উত্তর দিকে বিগ্রহের বেদী বলে সেদিক থেকে গর্ভগৃহে ঢোকা যায় না ; কিন্তু অন্য তিন দিকেই প্রবেশপথ আছে। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়াল বরাবর চারটি খিলানের উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা রক্ষিত। এত বিশদ স্থাপত্যের নবরত্ন মন্দিরে উপরে উঠবার সিঁড়ির অনুপস্থিতি এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। দ্বিতলের চার কোণের সব কটি চূড়াই ভেঙে পড়েছে ; মন্দিরটিও ছেয়ে গেছে লতাগুল্মে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৫½' (৭.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৫.২ মি.), এ মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখভাগের (দক্ষিণের) দেওয়ালের বাইরের দিকে চুনবালির পলস্তারার উপর কিছু পদ্মের নকাশি কাজ দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলক এখন বিশেষ কিছু না থাকলেও দক্ষিণের দেওয়ালে কয়েকটি প্রস্ফুটিত পদ্মের ফলক উৎকীর্ণ আছে। গঠন-স্থাপত্যের বিচারে মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়। বৈশাখ মাসের বারোয়ারি-পূজা ও শিবরাত্রির অনুষ্ঠান ছাড়া এ মন্দিরের শিবের এখন আর কোন উৎসবাদি হয় না।

সামান্য দক্ষিণে, এক বাঁধানো বেদীতে প্রতিষ্ঠিতা, বেলে-পাথরের এক অবয়বহীন খণ্ডকে স্থানীয় জনসাধারণ ষষ্ঠীজ্ঞানে খুব ভক্তি করেন। বিবাহ বা প্রসব হলেই এখানে বিশেষ পূজা দিতে হয়। জনশ্রুতি, এই ষষ্ঠীদেবী নাকি নবরত্ন মন্দিরটির সমসাময়িক।

গৌরাঙ্গচক : হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুনশীরহাট হয়ে নিয়মিত বাস চলে) মুনশীরহাটে নেমে, মুনশীরহাট-জয়নগরঘাট পিচের রাস্তায় (নিয়মিত বাস চলে) খিলাহাট থেকে সামান্য পূবে, উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত গৌরাঙ্গচক গ্রাম (জে. এল. নং ১৭২)। স্থানীয় বোধকপাড়ায় বোধক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজের (প্রস্তরনির্মিত কূর্মমূর্তি) দক্ষিণমুখী একটি একদুয়ারী, আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। তার সামনের দেওয়ালে কোন অলংকরণ না থাকলেও কার্নিসের নীচে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রী শ্রীধম্মরাজ / সন ১১৬৯ সাল / শ্রীরামজিবন বোদক / শ্রীসরুপ মিস্ত্রি।" ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১০'৯" (৩.৩ মি.), প্রস্থে ১০' (৩.১ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.)। প্রতিষ্ঠাতা-পরিবার সম্প্রতি মন্দিরটির সংস্কার করেছেন।

চন্দ্রভাগ : 'কানাইপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঁচা রাস্তায় কানাইপুরের ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) দক্ষিণে, বাগনান থানার অন্তর্গত চন্দ্রভাগ গ্রাম (জে. এল. নং ৯০)। স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের হুকুরাম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত ইটের, অলিন্দবিহীন, তেরোটি আটচালা শিবমন্দির এখানকার দ্রষ্টব্য পুরাকীর্তি। পুবমুখী এক সারিতে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, যথাক্রমে, চন্দ্রশেখর, কেদারনাথ, অভয়শরণ ও রামশরণ শিবের যে চারটি মন্দির আছে, প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে সেগুলি ১৭৩৩ শকাব্দে (১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত। এ মন্দিরগুলি দৈর্ঘ্যে ১৩'৬" (৪.৬ মি.), প্রস্থে ১১'৬" (৩.৬ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি.)। পশ্চিমমুখী মন্দির দুটির উত্তরেরটি ভুবনেশ্বর এবং দক্ষিণেরটি হরনাথ শিবের। দুটিই দৈর্ঘ্যে ১২'৪" (৩.৮ মি.), প্রস্থে ১২' (৩.৭ মি.), এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি.)। দক্ষিণমুখী মন্দির দুটিতে শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত থাকলেও তাঁদের নাম জানা যায় না। উত্তরমুখী পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে পূর্ব প্রান্তের মন্দিরটি বিধ্বস্ত এবং এই সারির অন্যান্য মন্দিরগুলিও নিতান্ত জীর্ণ। দক্ষিণমুখী ও উত্তরমুখী মন্দিরগুলি দৈর্ঘ্যে ১২' (৩.৭ মি.), প্রস্থে ১১'৬" (৩.৫ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.)। সবগুলি মন্দিরের ছাদই গর্ভগৃহের চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকৃত আঞ্চলিক ইতিহাসের বিবরণসংবলিত 'সংক্ষিপ্ত পল্লীচিত্র' নামক পুস্তকে এই শিবমন্দিরগুলি সম্পর্কে লেখা হয়েছে : "বাংলা সন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চন্দ্রভাগে পুণ্যশ্লোক হুকুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বাদশ শিব স্থাপন এবং মহাভারত-পুরাণপাঠ উপলক্ষে চারি মাস ব্যাপক কাল বিশেষ সমারোহের সহিত বিস্তর লোককে ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করতঃ বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নির্বিঘ্নে পুণ্যকীর্তি স্থাপন করেন। এই মহতী ক্রিয়া সন ১২১৮ সালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।"

সম্প্রতি ভারত সরকারের জনগণনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত গ্রাম-সমীক্ষা পর্যায়ের 'চন্দ্রভাগ' নামক পুস্তকে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে ভুলক্রমে বলা হয়েছে : "The temples were established by the Chatterjees of the village about two hundred and fifty years ago." বাংলা-মন্দিরের স্থাপত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এগুলি যে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের তা চোখে দেখেই স্থির করতে পারবেন।

চাঁতুল : 'ইছাপুর' নিবন্ধে পাতিহালে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) পূবে, জগৎবল্লভপুর থানার এলাকাধীন চাঁতুল গ্রাম (জে. এল. নং ১২)। স্থানীয় ব্রাহ্মণপাড়ায় মজা কানা নদীর তীরে একটি পরিত্যক্ত, সপ্তরথ, ইটের শিখর-দেউল এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজীউর এই দক্ষিণমুখী দেবালয়ের গণ্ডী অংশ বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের শিখর-রীতির মন্দিরের মত সমান্তরাল উদ্‌গত পটি দিয়ে অলংকৃত। ভিতরের ছাদ প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী ধাপ-পদ্ধতিতে গঠিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮' (২.৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি.), এ মন্দিরে লিপিফলক না থাকলেও আকৃতি দেখে এটিকে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। পরিত্যক্ত হলেও এটি এখনও অক্ষত অবস্থায় টিঁকে আছে। তবে কানা নদীর পাশে যেরূপ ব্যাপকভাবে বালির খাদ খোঁড়া হচ্ছে, তাতে অচিরেই এটি বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা।

গ্রামের কুমোরডাঙ্গায় বালির খাদ খননকালে কষ্টিপাথরের পাল-যুগের একটি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। স্থানীয় উৎসাহী জনসাধারণ কানা নদীর উপর পুলের পশ্চিমে এক অস্থায়ী চালাঘরে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনার ব্যবস্থা করেছেন। মূর্তিটির উচ্চতা ২½' (৭৬ সে.মি.) এবং প্রস্থ ১' ২½" (৩৭ সে.মি.)।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় (চন্দনপুর) খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে নির্মিত পশ্চিমমুখী একটি তিন-গম্বুজ মসজিদ আছে। সেটি দৈর্ঘ্যে ৩৮½' (১১.৮ মি.), প্রস্থে ১৩½' (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি.)। গম্বুজগুলি চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত।

চেঙ্গাইল : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের চেঙ্গাইল স্টেশনের উত্তর পাশে উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত চেঙ্গাইল গ্রামে (জে. এল. নং ১০৫) পশ্চিম-মুখী একটি তিন-গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ২৮' ৬" (৮.৭ মি.), প্রস্থে ১০' ৬" (৩.৩ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ সৌধের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত তিনটি গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে চুনবালির পলস্তারায় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠালিপিটি উৎকীর্ণ আছে : "এলাহি ভরসা সন ১১০৯ সাল তাং ৮ই জৈষ্ঠ, শুক্রবার।" ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদের লিপিফলকে বঙ্গাব্দের ব্যবহার কিছুটা অভিনব।

চোঙঘুরালি : হাওড়া-পানপুর পিচের সড়কে (বর্তমানে জালালসি পর্যন্ত বাস চলে) পূর্বতন মার্টিন-রেলের মাজু স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) দক্ষিণ-পূবে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত চোঙঘুরালি গ্রাম (জে. এল. নং ৩৮)। স্থানীয় দেঁড়েপাড়ায় দেঁড়ে পরিবারের গৃহদেবতা মদনমোহনজীউর (কৃষ্ণরাধিকামূর্তি) ইটের, দক্ষিণমুখী, অলিন্দযুক্ত আটচালা মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। এটির সামনের দেওয়ালে একদা যেসব পোড়ামাটির অলংকরণ ছিল এখনও তার দু একটি দেখা যায়। অপটু সংস্কারের কল্যাণে বাকী প্রায় সবই লুপ্ত। প্রবেশপথের উপরের লিপিটি নষ্ট হওয়ায় পশ্চিম দিকের অতিরিক্ত দরজার উপরে পরবর্তীকালে চুনবালির পলস্তারায় লেখা হয়েছে : "স্থাপিত ১১১২ সাল মদনমোহনজীউ।" দেবালয়টি, অতএব, ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ত্রিখিলান দালানের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার টানা-খিলান দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১৬′ ৭″ (৫.১ মি.), প্রস্থে ১৫′ ৩″ (৪.৭ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৩৫′ (১০.৭ মি.), এ মন্দিরটি একদা হয়ত 'টেরাকোটা'-সজ্জার জন্য মূল্যবান ছিল।

গ্রামের সরকারপাড়ায় স্থানীয় জমিদার কেনারাম সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীনাথ শিবের ইটের, দক্ষিণমুখী, অলিন্দবিহীন একটি আটচালা মন্দির আছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৬″ (৩.৩ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০′ (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। একদুয়ারী প্রবেশপথের পাদমূলে চুনবালির পলস্তারায় উৎকীর্ণ তিন পঙ্‌ক্তির ক্ষয়িত লিপিটির পাঠ : "………শ্চন্দ্র স্যোন / মিস্ত্রি শাং রায়চক / সন ১২৯২ সাল।" মন্দিরটি, অতএব, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং সঠিক বিচারে, এখনও পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে না।

সরকার পরিবারের কাছারিবাড়ির প্রবেশপথে নানান নকশাযুক্ত খোদাই-করা কাঠের একটি মনোরম দরজা আছে। চৌকাঠে ক্ষোদিত লিপিটি থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের 'সূত্রধর'-সম্প্রদায়ের মত কর্মকার-সম্প্রদায়ের কারিগররাও কাঠখোদাই শিল্পে সমান নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এক পঙ্‌ক্তির লিপিটি নিম্নরূপ : "সন ১২৮০ শাল তারিখ ৩২ শ্রাবণ কৃত শ্রীমহেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার শাং মদ্ধম মাজু জেলা হাওড়া পং বালিয়া।" হাওড়া জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে একদা যে বহু দারুতক্ষণশিল্পী কাঠের রথ

ও বিগ্রহ প্রভৃতি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন (এখনও দু একটি কেন্দ্রে হতাবশিষ্ট কয়েকজনের দেখা মেলে), এ লিপিটি তার অন্যতম প্রমাণ।

গ্রামের দক্ষিণ অংশে গুড়েপাড়ায়, চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কল্যাণেশ্বর শিবের একটি পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, ইটের, আটচালা মন্দির আছে। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। এ দেবালয়ের দৈর্ঘ্য ১০' ৩½" (৩.২ মি.), প্রস্থ ১০'২" (৩.১ মি) এবং উচ্চতা প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। প্রধান প্রবেশপথের উপর চুনবালির পলস্তারায় উৎকীর্ণ তিন পঙ্ক্তির প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ: "শকাব্দা ১৮০৬/ সন ১২৯২ সাল/ ১৫ বৈশাখ।" মন্দিরটি, অতএব, ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দক্ষিণের অতিরিক্ত প্রবেশপথের পাদমূলে উৎকীর্ণ আর একটি তিন লাইনের লিপি নিম্নরূপ: "শ্রীদিগম্বর দে তস্ত পুত্র। / শ্রীরামকুমার দে দ্বারা / নির্ম্মীত সাং সেনহাট।"

গ্রামের দোলতলায় ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি দোলমঞ্চের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক বকুল গাছের নীচে 'ক্লোরাইট' পাথরে নির্মিত পালযুগের একটি বিষ্ণুমূর্তি বাসুদেবজ্ঞানে উপাসিত। এটি উচ্চতায় ৩' ১০" (১.২ মি.) এবং প্রস্থে ১' ১১" (৫৯ সে. মি.)।

জগৎবল্লভপুর: 'ইছানগরী' নিবন্ধে জগৎবল্লভপুর থানার সদর জগৎবল্লভপুর গ্রামে (জে. এল. নং ৪) পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৌশিকী বা কানা দামোদরের তীরে অবস্থিত এ পল্লী যে একদা খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল তা স্থানীয় বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ ও ভগ্ন অট্টালিকাগুলি থেকে প্রমাণ হয়। তার মধ্যে, পিচের সড়কের ধারে, পাল পরিবারের ইটের, পুবমুখী, অলিন্দযুক্ত আটচালা শিবমন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে প্রথাগতভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য এবং ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক নীচের সারিতে শিকার ও যুদ্ধযাত্রার চিত্র এবং উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়। লিপিফলকটির পাঠ: "শুভমস্তু সকাব্দ ১৬৮৫ / সন ১১৭০।" দেবালয়টি, অতএব, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং হাওড়া জেলার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মন্দিরগুলির অন্যতম। দুঃখের বিষয়, সংস্কারের নামে মন্দিরটিতে সাদা, নীল ও লাল রং লাগানো হয়েছে যা একান্তই দৃষ্টিকটু। ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১৭' (৫.২ মি.), প্রস্থে

১৫′ (৪.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের সামান্ত পূবে, কালীতলাবাজারে, দক্ষিণমুখী একটি একদুয়ারী আটচালা শিবমন্দির আছে। এটির সম্মুখভাগেও লঙ্কাযুদ্ধের 'টেরাকোটা'-সজ্জা দেখা যায়। লিপিফলক অনুসারে মন্দিরটি ১৬৬১ শকাব্দে (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত এবং সেজন্য বেশ প্রাচীন। ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

ষষ্ঠীতলায় আর একটি পুবমুখী, অলিন্দবিহীন, সাধারণ আটচালা মন্দিরের সম্মুখভাগেও পোড়ামাটির ফলকে লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং একদুয়ারী প্রবেশপথের দু ধারে দুটি দ্বারপালের 'টেরাকোটা'-মূর্তি বসানো আছে। লিপিফলক অনুসারে ১৬৯৯ শকাব্দে (১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

অদূরেই মহেশ্বরের শিবের ইটের, পশ্চিমমুখী আর একটি অলিন্দবিহীন আটচালা মন্দির দেখা যায়। সামনের দেওয়ালে ইতস্ততঃ উৎকীর্ণ কয়েকটি পোড়ামাটির পদ্মফুল ছাড়া এ দেবালয়ে আর কোন অলংকরণ নেই। প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ: "শকাব্দা ১৭২৪ সন ১২০৯ তারিখ ১৪ই ফাল্গুন।" ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

পিচের সড়কের পাশেই 'শাহী মসজিদ' নামে এক-গম্বুজযুক্ত একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। খাদেমরা দাবী করেন, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নাকি এই উপাসনালয় নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তার স্বপক্ষে কোন লিপি-প্রমাণ নেই।

জগৎবল্লভপুর-ইছানগরীর সীমানায় একদা-প্রবাহিত কানা নদীর ধারে বালির খাদ খননের সময় প্রায় ১০′ (৩.১ মি.) নীচু থেকে কিছুকাল আগে যেসব পুরাবস্তু পাওয়া যায়, তার বিশদ বিবরণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'Human Events' নামক পত্রিকায় (জুন: ১৯৬৯ সংখ্যা) মুদ্রিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পোড়ামাটির নলযুক্ত নানাবিধ মৃৎপাত্র, প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ছাপ দেওয়া লিপিযুক্ত একটি পোড়ামাটির ফলক এবং দুটি অদ্ভুত ধরনের 'টেরাকোটা'-মূর্তিকা। শেষোক্ত পুরাবস্তু দুটি গোলাকার কাঁপা ঘটের গায়ে লাগানো আদিম প্রভাবযুক্ত মস্তক, যেগুলি দক্ষিণ ২৪-পরগনার 'বারাঠাকুর'-এর মূর্তির সদৃশ। প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণুমূর্তির দু একটি ভগ্ন অংশও এখানে পাওয়া যায়। খননকার্য বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত না হয়ে থাকলেও

অনুমান হয়, এ অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল।

জঙ্গলপাড়া : 'উদয়নারায়ণপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলপাড়া গ্রাম উদয়নারায়ণপুরের পুব পাশের জঙ্গলপাড়া-বেলগ্রাম মৌজায় (জে. এল. নং ৩৬) অবস্থিত। স্থানীয় বৈষ্ণবপাড়ায় মাজি পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর (শালগ্রাম) পরিত্যক্ত দেবালয়টি এ গ্রামের উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। মাজি পরিবার বর্তমানে তাঁদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী এ আটচালা মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। মন্দিরগাত্রে এখনও উল্লম্বভাবে চারটি ও অনুভূমিকভাবে পাঁচটি 'টেরাকোটা'-পদ্মফুলের ফলক অবশিষ্ট থাকলেও গোটা ইমারতটিই মাটির নীচে প্রায় ৩' (৯২ সে. মি.) বসে গিয়েছে। সামনের কার্নিসের নীচে 'টেরাকোটা'-প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "৭ শ্রীশ্রীহরিঃ সন ১১৮১ সাল / সুভামস্তু সকাব্দা ১৬৯৬ সক।" ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' ৬" (৩.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২২' (৬.৭ মি.)। মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

জয়ন্তী : 'আমতা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমতার পশ্চিমে, দামোদরের ওপারে, বেতাই-বন্দর থেকে দক্ষিণমুখী কাঁচা রাস্তায় প্রায় ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) দূরে আমতা থানার জয়ন্তী গ্রাম (জে. এল. নং ১২৩)। আঠারো শতকের মধ্যভাগে স্থানীয় 'কবিকিঙ্কর' রচিত 'সত্যপীর পালা'র একটি অপ্রকাশিত পুঁথির (বাগনানের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত) পুষ্পিকায় জয়ন্তী গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। কবি তাঁর ভণিতায় বলেছেন : "শ্রীকবিকিঙ্কর গান জোইন্তি গ্রামে ঘর। / পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥"

গ্রামের লাহাপাড়ায় পুবমুখী একটি সপ্তরথ শিখর-দেউল এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রবেশপথের উপরে পাথের পলস্তারায় ক্ষোদিত এক পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "সায়াহ্নে সূর্যনারায়ণের নামই শিব।" শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ আর একটি প্রতিষ্ঠাফলকের পাঠ—"স্থাপিত ১২৭৫ সাল / শ্রী শ্রীমন্তনাথ লাহা / ১৩৪৬ / শ্রীগোষ্ঠ-বিহারী লাহা।" এ থেকে অনুমান করা যায়, ১২৭৫ বঙ্গাব্দে (১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রথমোক্ত ব্যক্তি এ মন্দির নির্মাণ করান এবং শেষোক্ত ব্যক্তি তার সংস্কারের দায়িত্ব বহন করেন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (১৯৩৯

খ্রীষ্টাব্দে)। গর্ভগৃহের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানের উপর অর্ধগোলাকৃতি টানা-খিলান দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮' (২·৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি.)। আলোচ্য দেবালয়টি হাওড়া জেলার অল্পসংখ্যক শিখর-দেউলের অন্যতম।

জয়পুর: 'খড়িয়প' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খড়িয়প থেকে ঝিখিরাগামী পিচের সড়কে ('ট্যাক্সি' পাওয়া যায়) প্রায় ৪ মাইল (৬.৪ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে, জয়পুর-ফকিরদাস ইনস্টিটিউশনের কাছ থেকে বাঁ-হাতি কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) দক্ষিণে গেলে, আমতা থানার অন্তর্গত জয়পুর গ্রাম (জে. এল. নং ১০৫)। এখানে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি আছে। সাঁতরাপাড়ায় 'মতি-লাল' ধর্মঠাকুরের ইটের, পশ্চিমমুখী, অলিন্দবিহীন, আটচালা মন্দিরটি অভিনব এই জন্য যে লৌকিক দেবতা ধর্মরাজের উপাসনার জন্য পাকা মন্দিরের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে মুষ্টিমেয়। ভূমিকম্পের ফলে কিছুটা বসে যাওয়া ছাড়াও দেবালয়টি অবহেলায় জীর্ণ। অনুসন্ধানে প্রকাশ, আগে সামনের দেওয়ালে নাকি পোড়ামাটির অলঙ্করণসহ '১৬০৬ শকাব্দ'-অঙ্কিত একটি লিপিফলক নিবদ্ধ ছিল। এ সংবাদ ভ্রান্ত না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়টি হাওড়া জেলার প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম। প্রবেশ-পথের বাঁ দিকে পুরানো রীতির এক সারি পোড়ামাটির ফলক এখনও দেখা যায়। বিগ্রহ—'মতি' এবং 'লাল' নামের দুই ধর্মরাজের —যারা পরস্পরের ভাই হিসাবে কথিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' ৪" (৪.১ মি.), এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

জয়চণ্ডীতলায় দাস পরিবারের শ্রীধরজীউর (শালগ্রাম) ইটের, অলিন্দযুক্ত, দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। খিলানশীর্ষের তিনটি অংশে লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, কীর্তনের দল প্রভৃতি উৎকীর্ণ। ভিত্তিবেদী-অনুভূমিক দুটি সারির নীচেরটিতে প্রথাগত সামাজিক দৃশ্য ও উপরেরটিতে কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ। প্রবেশপথের দু পাশে এক সারি করে ও বাঁকানো কার্নিসের নীচে দু সারি কুলঙ্গিমধ্যস্থ মূর্তি-ভাস্কর্য প্রধানতঃ দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবীর। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতিকালে, এই প্রস্তুত সজ্জার উপরে সংস্কারের নামে চুনকাম করে তাদের ক্ষতিই করা হয়েছে। দু লাইনের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ: "শ্রীধর মন্দির স্থাপিত / সুভমস্ত সকাব্দা ১৭০৪।" ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে

নির্মিত এ মন্দিরের দালানের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার টানা-খিলান দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭' ১০" (৫.৫ মি.), প্রস্থে ১৭' (৫.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.)।

গ্রামের রায়পাড়ায় কালীরাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনজীউর ইটের, পুবমুখী, দোতলা দালান-মন্দিরটি বিশিষ্ট ধরনের। 'গাজীপুর' নিবন্ধে অনুরূপ আর একটি মন্দির বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ দেবালয়ে পোড়ামাটির অলংকরণের পরিবর্তে পঙ্খের কিছু নকাশি সজ্জা দেখা যায়। দুই পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সুভমস্তু / সকাব্দা ১৬৯৯ সক।" এটি, অতএব, ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় জলেশ্বর শিবের ইটের, পশ্চিমমুখী একটি চারচালা মন্দির আছে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত এ দেবালয়ের সামনে শিখর-মন্দিরের জগমোহনের মত আর একটি চারচালা দালান সংযোজিত হওয়ায় এটির স্থাপত্য-প্রকরণ বেশ অভিনবই বলা যায়। গর্ভগৃহ ও চারচালা দালানের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' ৩" (৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.)। দালানের দৈর্ঘ্য ১২' ৩" (৩.৮ মি.), প্রস্থ ৭' ৬" (২.৩ মি.) ও উচ্চতা আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.)। এ মন্দিরে কষ্টিপাথরে নির্মিত পালযুগের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এক বিষ্ণু-মূর্তির অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি উচ্চতায় ২' ৯½" (৮৫ সে.মি.) এবং প্রস্থে ১' ৩½" (৩৯ সে.মি.)। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ৭' (২.১ মি.) দৈর্ঘ্যের এবং ১' ৬" (৪৬ সে. মি.) প্রস্থের কালো পাথরের একটি সরদল (চৌকাঠ) পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটির মধ্যভাগে এক গণেশমূর্তি ক্ষোদিত। অদূরে একটি ২' (৬১ সে. মি.) বর্গাকার পাথরের পাদপীঠ অপর দ্রষ্টব্য। কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত, আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোন এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে এগুলি সংগৃহীত বলে মনে হয়।

যাঁর নাম থেকে এ গ্রামের নাম উদ্ভূত, সেই জনপ্রিয় লৌকিক দেবী জয়চণ্ডীর বিষয়ে কিছু না বললে স্থানীয় ধর্মজীবনের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ডিহিপাড়ায়, সংযুক্তভাবে বর্ধিত তিনটি প্রাচীন বট, অশ্বত্থ ও তেঁতুল গাছের নীচে, গোলাকার এক বৃহৎ বেদীর মধ্যস্থলে কুণ্ডমধ্যে তাঁর স্বামা-মূর্তি তাঁর ভৈরব যজ্ঞেশ্বরের অনুরূপ মূর্তির সঙ্গে একত্রে উপাসিত।

স্থানটি জয়চণ্ডীতলা নামেও পরিচিত। জনশ্রুতি, এই লৌকিক দেবদেবী উভয়েই স্বয়ম্ভু। গ্রামে অন্যান্য বিগ্রহের অভাব না থাকলেও, পৌষ-সংক্রান্তিতে জয়চণ্ডীর অন্নকূটই প্রধানতম স্থানীয় উৎসব।

জুজারসা : হাওড়া-উলুবেড়িয়া বাসপথে ধূলাগড়িতে নেমে, দেউল-পুরগামী পিচের সড়কে প্রায় ৩ মাইল (৪.৮ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে গেলে, পাঁচলা থানার অন্তর্গত জুজারসা গ্রামে (জে. এল. নং ৮) পৌঁছনো যায়। সেখানে এক 'গৌড়ীয় রাজা'র ভগ্ন প্রাসাদ, দীঘি ও একটি ঢিপি কিংবদন্তীর আবরণে জনমানসে বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু তিনি যে ঠিক কে ছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও জনশ্রুতি, এক যুদ্ধজয়ের শেষে, অসাবধানতাবশতঃ তাঁর পায়রা রাজপুরে ফিরে এলে রানী তাঁর পরাজয় অনুমান করে স্থানীয় 'ধনদীঘি'তে ডুবে আত্মহত্যা করেন। যুদ্ধপ্রত্যাগত রাজা এই পরিণতিতে শোকার্ত হয়ে নিজেও একই দীঘিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। পরিত্যক্ত এ রাজধানী তার পর ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এখনও এখানকার 'ঘোড়াখানার ডাঙ্গা' 'দেউলপোতা', 'করমখানার পুকুর', শতবিঘা আয়তনের 'ধনদীঘি', 'মহিষপুকুর', 'হরিজাপোতা', 'রাজারকোঠা' প্রভৃতি কিংবদন্তীর সেই 'গৌড়েশ্বর'-এর স্মৃতি বহন করছে।

জোকা : 'গৌরাঙ্গচক' নিবন্ধে মুন্সীরহাট পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুন্সীরহাট-জয়নগরঘাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জয়নগরঘাটে দামোদর পার হয়ে, উত্তরমুখী পাকা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) দূরে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত জোকা গ্রাম (জে. এল. নং ৪১)। এখানকার রায়পাড়ায় রায় পরিবারের পশ্চিমমুখী, তিনতলা দালান-মন্দিরটি পুরাকীর্তি হিসাবে একান্তই অভিনব। কারণ, এ দেবালয়ের তিনতলায় পাশাপাশি দুটি কুঠরির একটিতে ঘটস্থাপনায় শীতলা, মনসা ও প্রস্তরখণ্ডে ষষ্ঠী এই তিন লৌকিক দেবী এবং অন্যটিতে পারিবারিক গৃহদেবতা দামোদরজীউ উপাসিত। এই ত্রিতল দালানটিকে মন্দির হিসাবে চিহ্নিত করবার জন্য সর্বোচ্চ স্থানে বসানো হয়েছে পিতলের পাতে খোদাই-করা এক চক্র এবং দণ্ডসহ পিতলের পাতযুক্ত পতাকা। পতাকার গায়ে ছিদ্র করে লেখা আছে—"ওঁ রাধাকৃষ্ণ পদে নমঃ।" মন্দিরটির ছাদে কড়ি-বরগার ব্যবহার হলেও, দোতলা ও তেতলায় ওঠার সিঁড়ির সরু পথটির উপরের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা রক্ষিত। ৫১' ৯" (১৫.৭ মি.) দৈর্ঘ্য, ২৪' ৩" (৭.৪ মি.) প্রস্থ ও প্রায় ৩৫' (১০.৭ মি.) উচ্চতার এই বৃহৎ দালানটি

সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন— একদা এটির একতলা ও দোতলা কাছারিবাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং সর্বোচ্চ তলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের পারিবারিক দেবতাগণ। এ দালান-মন্দিরের বহিরঙ্গ সজ্জায় পঙ্খের নানান ভাস্কর্য ছাড়াও প্রতিটি দরজার প্রবেশপথের ও দেওয়ালের কুলঙ্গির উপরে উৎকীর্ণ পঙ্খের উৎকৃষ্ট নকাশি অলংকরণ দেখা যায়। ত্রিতলে দামোদরজীউর (শালগ্রাম) প্রায় ৪' (১.২ মি.) উঁচু কাঠের সিংহাসনটির কারুকার্যও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। প্রথাগত দালান-মন্দিরের অনুকরণে সামনে স্তম্ভযুক্ত এই তিনতলা সিংহাসনের গায়ে যে অপরূপ ফুলকারি ভাস্কর্য ক্ষোদিত হয়েছে, তা মন্দিরের সামনে ফুল-লতা-পাতার মধ্যে বহু পাখির সমাবেশে রচিত পঙ্খের অলংকরণের মতই উচ্চ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। সিংহাসনটির আর এক বৈশিষ্ট্য, তার গায়ে উৎকীর্ণ এক লিপিফলক। সেটির পাঠ: "সন ১২০৩ সাল / তারিখ ২৫ চৈত্র।" অতএব, এ দেবগৃহ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। সিংহাসনটির পাশে রক্ষিত প্রায় ১২' (৪৬ সে. মি.) উচ্চতার একটি কাঠের গরুড়মূর্তিও কাঠখোদাইয়ের অনুপম নিদর্শন। গভীর পরিতাপের বিষয়, এমন বিরল ও অপূর্ব শিল্পকৃতিগুলি উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে।

ঝিংরা: 'ইছানগরী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইছানগরীর সংলগ্ন উত্তরের গ্রাম ঝিংরা (জে. এল. নং ২)। পিচের সড়ক থেকে ফার্লং খানেক (০.২ কি. মি.) কাঁচা রাস্তায় যেতে হয়। জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত এ পল্লীতে ১২৭৩ হিজিরায় (১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) স্থাপিত একটি ছয়-গম্বুজওয়ালা বড় মসজিদ আছে। পঙ্খের কিছু নকাশি অলংকরণযুক্ত মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫১' (১৫.৫ মি.), প্রস্থে ২৯½' (৯ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.)। মসজিদ-কক্ষে প্রবেশের জন্য তিনটি দরজা। খাদেমের মতে, কেন্দ্রীয়টির উপরের দেওয়ালে নিবদ্ধ মর্মরলিপিটির অর্থ—দবীরুদ্দীন ম্যাজিস্ট্রেট ১২৭৩ হিজিরায় এই উপাসনালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নাকি একদা হুগলীর জেলাশাসক ছিলেন। অর্পিত ওয়াকফ্ সম্পত্তির মোতোয়ালী ফুরফুরার পীর সাহেব। পদস্থ সরকারী চাকুরিয়ার প্রযত্নে নির্মিত এত বড় মসজিদ পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কাছেই, ঝিংরা-সীতাপুর পিচের সড়কের পাশে, যে এক-গম্বুজযুক্ত আর একটি ছোট মসজিদ আছে, তার আংশিক ভগ্নদশা থেকে সেটিকে বেশ পুরাতনই মনে হয়। স্থানীয় লোকের মতে, সেটি আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত। কিন্তু এ-বিশ্বাসের

সমর্থনে কোন লিপি বা অনুরূপ উপাদান নেই। হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমান্তবর্তী এ এলাকায় ঝিংরা (হাওড়া জেলা) এবং সীতাপুর ও ফুরফুরা (হুগলী জেলা) কাছাকাছি মুসলিম ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। শেষের গ্রাম দুটিতে অবস্থিত মসজিদ, দরগা প্রভৃতি এই সিরিজের 'হুগলী জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে বর্ণিত হবে।

ঝিখিরা : 'অমরাগ'ড়' নিবন্ধে আমতা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমতা-ঝিখিরা পিচের সড়কে, আমতা থেকে ৯ মাইল (১৪.৫ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে, আমতা থানার এলাকাধীন গ্রাম ঝিখিরা (জে. এল. নং ৬৫)। এখানে পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত বেশ কয়েকটি মন্দির আছে।

স্থানীয় মণ্ডল পরিবারের গৃহদেবতা দামোদরজীউর ত্রিখিলান দালানযুক্ত, দক্ষিণমুখী, আটচালা মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায়, যথাক্রমে, ১৮'৪" (৫.৬ মি.), ১৬'৮" (৫.১ মি.) এবং আনুমানিক ৩০' (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের আংশিক ক্ষয়িত প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"শ্রী শ্রীরামঃ............শকাব্দা ১৬৯১ শক সন ১১৭৬ সাল। শ্রীসুকদেব মিস্ত্রী গঠিত।" ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরের শুধু দক্ষিণ দেওয়ালেই 'টেরাকোটা'-সজ্জাগুলি নিবদ্ধ। খিলানশীর্ষের তিনটি প্যানেলেই লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য। এ ছাড়া ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক এক সারি পোড়ামাটির সজ্জায় সেকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নানান দৃশ্য উৎকীর্ণ। তার উপরেই সমান্তরালভাবে এক সারি কৃষ্ণলীলার দৃশ্য। এ ছাড়া দু পাশে দু সারি করে ও কার্নিসের সমান্তরাল আর দু সারি কুলঙ্গির মধ্যে ক্ষোদিত আছে দশাবতার ও বিবিধ পৌরাণিক মূর্তি প্রভৃতি। কারিগরি প্রশংসনীয় এবং মূর্তিগুলি এখনও বেশ অক্ষত। সামনের দালানের ছাদ টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

গ্রামের কাঁড়ারপাড়ায় -ত্রিখিলান দালানযুক্ত, দক্ষিণমুখী, আটচালা সীতানাথ (শালগ্রাম) মন্দিরের 'টেরাকোটা'-সজ্জা পূর্ববর্তী দেবালয়ের অনুরূপ। প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"শুভমস্তু শকাব্দা ১৭০৫।২।২৮।৮।৩২।" অর্থাৎ, ১৭০৫ শকাব্দের (১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের) পৌষ মাসের ২৮ তারিখে ৮ দণ্ড ৩২ পলের সময় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মিস্ত্রীর নাম উল্লিখিত না হলেও অলংকরণের সাদৃশ্য ও গ্রামবৃদ্ধদের কথায় মনে হয়, এটিরও নির্মাতা শুকদেব মিস্ত্রী। মাত্র ১৪ বৎসরের ব্যবধানে নির্মিত এ মন্দির দুটি একই কারিগরের হাতের কাজ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

ভিত্তির অনুভূমিক সারির ভাস্কর্যগুলি ক্ষয়িত হলেও খিলানশীর্ষের লঙ্কাযুদ্ধ ও দেবীযুদ্ধ এবং ডান পাশের দেওয়ালে বিদেশী রণতরীর দৃশ্যগুলি বেশ জীবন্ত। সামনের দালানের ছাদ টানা-খিলান ও গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, যথাক্রমে, ১৯'২" (৫.৯ মি.), ১৭'৪" (৫.৩ মি.) এবং আনুমানিক ৩০' (১০.৭ মি.)।

মধ্যপাড়ায় হাজরা পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর ছোট, নবরত্ন মন্দিরটির সম্মুখভাগে পোড়ামাটির অলংকরণের বদলে পঙ্খের পলস্তারার উপর ফুল-লতা-পাতা এবং জ্যামিতিক নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে। এ দেবালয়ের ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। লিপিফলকটি অস্পষ্ট হলেও, এটি উনিশ শতকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

মধ্যপাড়ায় অবস্থিত মল্লিক পরিবারের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরজীউর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি গ্রামের প্রাচীনতম দেবালয়। লিপি-ফলকের পাঠ—"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬১৩।" দৈর্ঘ্যে ১৫'৮" (৪·৮ মি.), প্রস্থে ১৫' (৪·৬ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৫' (৭·৬ মি.), এ মন্দিরটি অতএব ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ত্রিখিলান প্রবেশ-পথের উপরে একটিমাত্র গণেশমূর্তি ছাড়া বাকী অংশ লতাপাতার অলংকরণ ও প্রস্ফুটিত পদ্ম দ্বারা সজ্জিত। পাদমূলে, অনুভূমিক সারিতে, শিকারযাত্রার মিছিল, ইউরোপীয় জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত এ দেশের নরনারীবোঝাই রণতরী প্রভৃতির দৃশ্য। বাঁ দিকের অর্ধস্তম্ভটির গোড়ায় দুটি মিথুন-ভাস্কর্যের একটি নরনারীর ও অপরটি দুই হাঁসের। পশ্চিমবঙ্গের 'টেরাকোটা'-মন্দিরে পশুপক্ষীর মিথুন-ভাস্কর্য বিরল। দালানের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি টানা-খিলান এবং ঠাকুরঘরের ছাদ দুটি পাশ-খিলান ও চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

গ্রামের সরখেলপাড়ায়, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, দারুনির্মিত দেবী গড়চণ্ডীর ইটের, দক্ষিণমুখী, নবরত্ন মন্দিরটি আর এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরলিপির পাঠ—"শ্রী শ্রীহরি শ্রী শ্রীশুভমস্তু শকাব্দা ১৭১৭ শক সন ১২০২ সাল।" সামনের দেওয়ালে এক সারি অতি সাধারণ পোড়ামাটির ফলক ছাড়া অন্য অলংকরণ নেই। দেবীমূর্তি উপবিষ্টা, দ্বিবাহু, রক্তাম্বরা। তাঁর বাঁ পাশে মনসা ও শীতলার ঘট স্থাপিত। একই মন্দির-চত্বরে ছোট দুটি শিখর-দেউলে শিব 'বিশ্বেশ্বর' ও শালগ্রাম 'শ্রীধরজীউ' প্রতিষ্ঠিত। গড়চণ্ডী মন্দিরের ত্রিখিলান দালানের ছাদ

টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

এ দেবালয়ের সামান্য পুবে, জয়চণ্ডী দেবীর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। কাঠের তৈরী এ দেবীমূর্তির সঙ্গে গড়চণ্ডীমূর্তির খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়। ১৬৭২ শকাব্দে (১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) নির্মিত এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে গণেশ, দুর্গা, কার্তিক এবং ইতস্তত: নিবদ্ধ পদ্মফুলের ফলকগুলি দেখে মনে হয়, একদা এটিও বহুলঅলংকৃত ছিল। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় রায় পরিবারের দামোদরজীউর (শালগ্রাম) পূবমুখী আটচালা মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য। ১১৮৩ বঙ্গাব্দে (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়ের ত্রিখিলানযুক্ত সামনের দেওয়ালে প্রথাগতভাবে লঙ্কাযুদ্ধ, পাদমূলে সামাজিক দৃশ্য ও তার উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলা 'টেরাকোটা'য় রূপায়িত হয়েছে। সামাজিক দৃশ্যের মধ্যে একটি ফলকে হুঁকাসেবনরত ভূস্বামী ও তার সামনে উদ্যতভাবে বিবদমান দুই বলশালীর যে চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে তা একান্তই আকর্ষণীয়। দুঃখের বিষয়, সংস্কারের নামে এমন সব সুন্দর ভাস্কর্য-ফলকগুলির উপর পুরু চুনের প্রলেপ লাগিয়ে তাদের শ্রীহীন করা হয়েছে। দালানের ছাদ টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

দামোদর মন্দিরের পাশেই রায় পরিবারের শ্যামসুন্দরজীউর (শালগ্রাম) পূবমুখী আর একটি নবরত্ন মন্দির আছে। সেটির সামনের দেওয়ালে চুনবালির পলস্তারায় কিছু পৌরাণিক দেবদেবীমূর্তি প্রভৃতি দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকার-প্রকারে সেটি উনিশ শতকে নির্মিত বলেই মনে হয়। ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা-খিলান ও ঠাকুর-ঘরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

১২১৬ বঙ্গাব্দে (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত আর একটি আটচালা শিবমন্দিরও এ গ্রামে আছে। তার সামনে একটি দোলমঞ্চ এবং একই চত্বরের মধ্যে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত কালীর একটি দালান-মন্দিরেরও উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডিহি-ভুরশুট : 'আমতা' নিবন্ধে উদয়নারায়ণপুরে পৌঁছবার পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদয়নারায়ণপুর-ডিহি-ভুরশুট পিচের সড়কে

উদয়নারায়ণপুর থেকে ৪ মাইল (৬'৪ কি. মি.) উত্তরে, উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম ডিহি-ভূরশুট (জে. এল. নং ১)। দক্ষিণ রাঢ়ের এই ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরশুট গ্রাম একদা সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের ভারতবিখ্যাত দার্শনিক এবং 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীধরাচার্য এখানকার অধিবাসী ছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র হিসাবেও ভূরশুটের সুনাম প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং মোগল আমলে এটি এক পরগণার কেন্দ্রস্থল ('ডিহি') হিসাবে গণ্য হয়। বর্তমানে এখানে কোন পুরাকীর্তি না থাকলেও স্থানীয় পুষ্করিণী প্রভৃতি খননের সময় নানা পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। গ্রামের মধ্যপাড়ায় মাটির তলায় প্রাপ্ত বাঁধানো ইটের দেওয়াল, প্রাচীনকালের পোড়ামাটির পাট-দেওয়া কুয়া এবং ইট-বিছানো রাস্তা ইত্যাদির নিদর্শন থেকে মনে হয়, এ অঞ্চলে প্রত্ন-তাত্ত্বিক খননকার্য চালালে, বহু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হতে পারে।

ডিহি-মণ্ডলঘাট : বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বরদাবাড় হয়ে ২ মাইল (৩'২ কি. মি.) পশ্চিমে, শ্যামপুর থানার রূপনারায়ণতীরবর্তী ডিহি-মণ্ডল-ঘাট গ্রাম (জে. এল. নং ৬৮)। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার মান্দারনের অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলঘাট পরগণার যে উল্লেখ পাওয়া যায়, আলোচ্য গ্রামটি হয়ত সেই পরগণার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরবর্তী ইংরেজ রাজত্বে, এটি তমলুক সল্ট এজেন্টের এলাকাধীন লবণ উৎপাদন ও বাণিজ্যের এক আড়তে পরিণত হয়। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি দক্ষিণাকালীর দালান-মন্দির। সেটির ত্রিখিলান অলিন্দ এবং গর্ভগৃহের ছাদ টানা-খিলানের উপর রক্ষিত। দেবালয়টি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০' ৬" (৬'৩ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১২' (৩'৭ মি.)। চতুর্ভুজা দক্ষিণা-কালীর মূর্তিটি কষ্টিপাথরে নির্মিত এবং সেটির গঠনভঙ্গিমার মধ্যে আদিম লৌকিক ভাবধারা বর্তমান। উচ্চতায় ৬" (১৫ সে. মি.) ও প্রস্থে ৩" (৭'৫ সে.মি.), এ বিগ্রহটি কত দিনের পুরাতন তা বলা না গেলেও, মন্দিরে পশুবলির যে ক্ষুদ্রাকৃতি অব্যবহৃত খাঁড়াটি দেখা যায়, তার গায়ে বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত আছে—"১০৮১ সাল।" সুতরাং, মনে হয় খ্রীষ্টীয় সতেরো শতক বা তার পূর্বেই দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে। প্রচলিত কিংবদন্তী—দেবীর সেবায়ত স্থানীয় ঘোষাল পরিবারের পনের পুরুষ আগেকার জনৈক দুর্গাপদ ঘোষালের বিধবা মাতাকে অদূরের কালীদহের বেতবনে দেবী দর্শন দিয়ে অদৃশ্য হন। পরে স্বপ্নাদেশের

পর দেবী আবির্ভূতা হলে তাঁকে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উত্তরকালে বর্ধমানরাজ নাকি বেশ কিছু দেবোত্তর সম্পত্তিও দান করেন।

একদা কালীদহ থেকে মাটি কাটার সময় নল-লাগানো বিভিন্ন ধরনের বহু পোড়ামাটির পাত্র পাওয়া যায়। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, স্থানীয় বেরা পরিবারের একটি পুষ্করিণী খননের সময়ও পোড়ামাটির ইটের বেড়-দেওয়া পাতকুয়া এবং ইটের রাস্তা পাওয়া গিয়েছিল। কালীমন্দিরের কাছেই এক বটগাছের তলায় প্রায় ২′ (৬১ সে. মি.) উচ্চতার ও ষষ্ঠীঠাকুর হিসাবে পূজিত পোড়ামাটির অদ্ভুতদর্শন মূর্তিটির সঙ্গে দক্ষিণ ২৪-পরগণায় বহুলউপাসিত বারাঠাকুরের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ডিহি-মণ্ডলঘাট গ্রামের অপর তীরবর্তী এলাকা তমলুক (তাম্রলিপ্ত)। সুতরাং এই অঞ্চলে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্য চালানো হলে হয়ত অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে পারে।

গ্রামের কাছারিতলায় বিশ্বাস পরিবারের পশ্চিমমুখী কমলেশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য। আগে সামনের দেওয়ালে পঙ্খের কাজ-করা কিছু লতাপাতার অলংকরণ ছিল; এখন নেই। মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′৩″ (৩·৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি.), এ মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যেতে পারে।

তাজপুর : বাগনান-আমতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ফতেপুরে নেমে, ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) পশ্চিমে, দামোদরের ওপারে, আমতা থানার অন্তর্গত তাজপুর গ্রাম (জে. এল. নং. ১৩১)। জনশ্রুতি, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পীর তাজ খাঁর নামানুসারে এ গ্রামের নাম হয় তাজপুর। যাবতীয় রোগহর প্রখ্যাত দেবতা স্থানীয় স্বয়ম্ভূ যুল্লেশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী দালান-মন্দিরটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। তাঁর গাজন উৎসবে দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তসমাগমের তুল্য জনসমাবেশ হাওড়া জেলার আর কোন দেবস্থানে দেখা যায় না। স্বয়ম্ভূ লিঙ্গটি প্রায় ৮′ (২.৪ মি.) গভীর কুণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। প্রবেশপথের দু পাশে চুনবালির একটি বৃষ ও একটি গরুড়মূর্তি দেখা যায়। মন্দিরের ছাদে এমন স্থানে একটি ফুকর রাখা হয়েছে যাতে সূর্যের আলো শিবলিঙ্গের মাথায় এসে পড়লে নিত্যপূজা আরম্ভ হতে পারে।

তেলিহাটি : 'জগৎবল্লভপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জগৎবল্লভপুরের উত্তরে অদূরবর্তী গ্রাম তেলিহাটি

(জে. এল. নং. ৩)। কানা নদীর তীরে অবস্থিত ও জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত এই পল্লীতে একদা বালির খাদ খননের সময় কতকগুলি পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৫½" (১৪ সে. মি.) পাটাতনের উপরে 'বা রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদাই করা কষ্টিপাথরের একটি বিষ্ণুপট্ট। প্রথাগতভাবে বিষ্ণুর দুই স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বদলে এখানে ক্ষোদিত হয়েছে মকরবাহন গঙ্গা এবং কূর্মবাহন যমুনা। বিষ্ণুপট্টটির অপর দিকে আছে প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়ির মধ্যে দশাবতারের মূর্তি। ভাস্কর্যশৈলী থেকে এটিকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের বলে অনুমান করা যায়। এই পুরাবস্তুটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রক্ষিত থাকবার কথা। অন্যান্য আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর মধ্যে আছে কষ্টিপাথরে নির্মিত দ্বাদশ শতকের একটি উমালিঙ্গনমূর্তি (উচ্চতা ৬" ও প্রস্থ ৩") (১৫ সে. মি. এবং ৭.৫ সে. মি.) এবং একটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির উপরের অংশ। শেষোক্ত মূর্তি দুটি বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত।

থানা মাকুয়া: হাওড়া-বকুলতলা-বোটানিক্যাল গার্ডেন পিচের সড়কের পাশে (নিয়মিত বাস চলে) শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত থানা মাকুয়া গ্রাম (জে. এল. নং ৪০)। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে অবস্থিত বাগিচা-অধীক্ষকের বর্তমান আটকোণা বাসগৃহটিই এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। মগদের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য মেটিয়াবুরুজের অপর তীরে, শিবপুরের কাছে ভাগীরথীকূলে, যে দুর্গটি একদা নির্মিত হয়েছিল তা প্রথমে মাগুয়া দুর্গ নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে স্থানটির নাম হয় থানা মাকুয়া। ভ্যানডেনব্রুকের (১৬৬০ খ্রীঃ) মানচিত্রে এ জায়গার নাম দেখানো হয়েছে 'থানা কিল্লা'। ইংরেজরা এটিকে 'টানা ফোর্ট' নামেও তাঁদের নথিপত্রে উল্লেখ করেছেন। মাকুয়া দুর্গ, থানা কিল্লা বা টানা ফোর্টের পরবর্তী ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বারো-তেরো বছর পরে, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য ট্যাপিওকা চাষের পরিকল্পনা করে জনৈক ইংরেজ, মেজর কিড্, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কমিটি অফ রেভেনিউ-এর কাছে এ দুর্গ ও আশপাশের জমি বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা জানান। সরজমিন তদন্তকারী আমিনের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, পুরাতন দুর্গ এলাকার মধ্যে ৬৭ বিঘা এবং তার উত্তরে আরও ৭০ বিঘা জমি আছে। তদন্তের সময় দুর্গের থানাদার-বংশের লোক বলে কথিত পাঁচ ব্যক্তি ঐ ভূমির স্বত্বদখলের যে দলিল হাজির করেন তা থেকে জানা

যায়, দুর্গটির নির্মাণকর্তা মোগলরা নন, বাংলার স্বাধীন সুলতান গৌড়ের হুসেন শাহ্। পরবর্তীকালে এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মগদের দখলে যাওয়ায় এটির নাম হয় মগের থানা এবং পরে থানা মাকুয়া বা মাকুয়া। কোম্পানীর কমিটি অফ রেভেনিউ ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে অগস্ট তারিখের হুকুমনামায় মেজর কিড্‌কে দুর্গের ভিতরের ৩৪ বিঘা জমির দখল দেন এবং বাকী জমি দুর্গের গোলন্দাজ-বংশধরদের অধিকারে থাকার ব্যবস্থা করেন। (Proceedings of the Committee of Revenue dated the 12 August, 1782)। কিড্ পুরাতন দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে চারিদিকের গড় ভরাট করে ফেলেন এবং দুর্গের ভিত্তির উপর যে দুটি আটকোণা বাড়ী নির্মাণ করেন তার অবশিষ্টটি বর্তমানে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধীক্ষকের বাসগৃহ। (J. M. Ghosh : Magh Raiders in Bengal : 1960).

দক্ষিণ মাজু: 'গোবিন্দপুর' নিবন্ধে দক্ষিণ মাজু পৌঁছনোর পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জগৎবল্লভপুর থানার এলাকাধীন এ গ্রামের (জে. এল. নং ৩২) কোলেপাড়ায় পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, দামোদরজীউর আটচালা মন্দিরটি স্থানীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রায় ৫' (১.৫ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত ও বর্তমানে জীর্ণ এ দেবালয়ের সম্মুখভাগ একদা পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট অলংকরণে সজ্জিত ছিল : ইতস্ততঃ নিবদ্ধ কয়েকটি সুন্দর ফলক এখনও দেখা যায়। যথা, নূপুর পরিধানরত কৃষ্ণ, ঢাল-তলোয়ার হাতে যোদ্ধা, কৃষ্ণ-বলরাম, রাজপুরুষ, বানর ভক্ষণরত কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফলকটি রাবণের এক সুদৃশ্য প্রতিমূর্তি। কোন লিপিফলক না থাকলেও স্থাপত্য-ভাস্কর্যশৈলী থেকে এটি আনুমানিক আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' ৮½" (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৩০' (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

দেউলপুর: 'জুজারসা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাঁচলা থানার অন্তর্গত জুজারসার পার্শ্ববর্তী গ্রাম দেউলপুর (জে. এল. নং ১২)। পোলো খেলার বল তৈরির জন্য বিখ্যাত এ গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় ঘোষ পরিবারের পূর্বপুরুষদের নির্মিত উত্তরমুখী একটি বারোচালা মন্দির এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। বারোচালা দেবালয় পশ্চিমবঙ্গে বিরল। তা ছাড়া চালাগুলির ত্রিরথ-বিন্যাসও অভিনব। মন্দিরটির পিছন ছাড়া আর তিন দিকের দেওয়ালে, বাঁকানো

কার্নিসের নীচে, এক সারি করে পোড়ামাটির ঘোড়া, সিংহ, হাতি, ভালুক, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণকাহিনী, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর ভাস্কর্য নিবদ্ধ আছে। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে ঘোষ পরিবারের কাছ থেকে জানা যায় যে, ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৺জটিরাম ঘোষ এটি নির্মাণ করান। মন্দিরের চাতালের সামনে একটি লিপিতে নাকি ক্ষোদিত ছিল---"যজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রি সাং কেশবপুর।" কিন্তু পরে, সংস্কারের সময়, তা নষ্ট হয়েছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২৫′ (৭·৬ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা গঠিত।

দেউলী : বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডিহি-মণ্ডলঘাটের ১ মাইল (১·৬ কি. মি.) দক্ষিণে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত দেউলী গ্রাম (জে. এল. নং ৮৭)। স্থানীয় হাটতলায় প্রতিষ্ঠিতা বানেশ্বরী দেবীর থানে পাথরে খোদাই-করা কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি নারায়ণ, শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দজ্ঞানে পূজিত। সেগুলি কোন প্রাচীন মন্দিরের ব্যবহৃত পাথরের দ্বারপার্শ্ব বলে মনে হয়। সিন্দূরলিপ্ত হওয়ায় মূর্তিগুলির আকৃতি অস্পষ্ট। তবে গ্রামের 'দেউলী' নাম থেকে অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয় যে, এখানে একদা কোন প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে অনুমান সমর্থনের জন্য পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

দেবীপুর : 'আমতা' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমতার পশ্চিমে, দামোদরের ওপারে, বেতাই-বন্দর থেকে গড়ভবানীপুরগামী পিচের সড়কের পাশে (নিয়মিত মোটর চলে), উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৪৯)। স্থানীয় শিবতলায় কাশীনাথ শিবের দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগে কোন অলংকরণ না থাকলেও পঙ্খের পলস্তারার উপর ক্ষোদিত এক পঙ্‌ক্তির একটি ক্ষয়িত লিপিতে স্থপতি-কারিগরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যথা, "...শ্রীমহেশচন্দ্র সেন ছুত্রধর সাকিম রায়চক।" শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ তিন লাইনের আর একটি লিপির পাঠ : "শ্রীশ্রীকাশীনাথ মহাদেব / সেবকি শ্রীমত্যা গোবিন্দমনি দাস্যা / ১২৭৪ সাল।" নীচে "রামধন মিস্ত্রি" কথা দুটিরও উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ, রামধন মিস্ত্রি কেবলমাত্র এই প্রতিষ্ঠালিপির খোদাইকারক ছিলেন। দৈর্ঘ্যে ১৩′৪″ (৪·১ মি.), প্রস্থে ১১′৫″ (৩·৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২২′ (৬·৭ মি.), এ

দেবালয়ের আয়তাকার গর্ভগৃহটিকে পুব-পশ্চিমে পাশ-খিলান দ্বারা বর্গাকার করে নিয়ে ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত হয়েছে।

দত্তপাড়ায় রায়, বসু ও দত্ত পরিবারের দক্ষিণমুখী, দশভুজা ও গোপালজীউর দালান-মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর হলেও ধাতুনির্মিত দশভুজা ও রাধিকা এবং কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি, দেবী দশভুজার নামানুসারেই গ্রামের নাম দেবীপুর। দৈর্ঘ্যে ২০′ (৬·১ মি.), প্রস্থে ১৬′৬″ (৫ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ১৫′ (৪·৬ মি.), এ দেবালয়ে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই কিন্তু আকার-প্রকারে এটিকে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলেই মনে হয়।

ধসা : হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুনশীরহাট হয়ে নিয়মিত বাস চলে) মুনশীরহাটে নেমে, পানপুরগামী পিচের রাস্তার (অটো-রিক্‌শ বা সাইকেল-রিক্‌শ পাওয়া যায়) পাশে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ধসা গ্রাম (জে. এল. নং ২৮)। স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্রচূড়' শিবের পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী একটি আটচালা মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। তার সম্মুখভাগে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যের 'টেরাকোটা'-রূপায়ন থাকলেও মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে খুবই জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সামনের কার্নিসের নীচে পোড়ামাটির ফলকে যে দু লাইন লিপি আছে তা নিম্নরূপ : "শুভমস্তু সকা/ব্দা ১৬৫৭ সক।" দেবালয়টি অতএব বেশ প্রাচীন—১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ ১০″ (৪·৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি.), এ মন্দিরের ছাদ দুটি পাশ-খিলান ও গর্ভগৃহের চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর রক্ষিত।

চৌধুরী পরিবারের গোপীনাথজীউর চারচালা দালানসহ, দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি আর এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। ত্রিখিলান দালানের মাঝখানের খিলানের উপর লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য এবং অন্য খিলানশীর্ষে ও তাদের দু পাশের দেওয়ালে নকাশি 'টেরাকোটা'-সজ্জা উৎকীর্ণ। এ ছাড়া চতুর্দিকে লতা-বন্ধনীর মধ্যে কুলঙ্গিতে স্থাপিত কৃষ্ণরাধিকা, যোদ্ধা প্রভৃতির মূর্তিও দেখা যায়। মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১৮′ ৯″ (৫·৭ মি.), প্রস্থ ১৭′ ৬″ (৫·৩ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ৩৫′ (১০·৭ মি.)। চারচালা দালানটির দৈর্ঘ্য ১৬′ ৩″ (৫ মি.), প্রস্থ ৮′ ৫″ (২·৫ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ২০′ (৬·১ মি.)। সামনের দালান ও গর্ভগৃহের

দেওয়ালের মধ্যে ৬" (১৫ সে. মি.) পরিমাণ ব্যবধান লক্ষণীয়। দালানের ছাদ কুব্জপৃষ্ঠ খিলান ('ভোল্ট') দিয়ে এবং গর্ভগৃহের ছাদ পুব-পশ্চিমে পাশ-খিলানের সাহায্যে বর্গাকার করে নিয়ে চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর রক্ষিত। সংস্কারের প্রচেষ্টায় মন্দিরটির সুন্দর 'টেরাকোটা'-সজ্জার উপরে গোলাপী রঙের চুনগোলা লাগিয়ে তাদের ক্ষতিই করা হয়েছে। পুরাতন লিপিফলকটি নষ্ট হওয়ায়, চুনবালির পলস্তারার উপর লেখা আছে : "১৬৩০ শক / ১২৯৯ সাল ম্যারামত।" সুতরাং, ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার হয়েছে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে।

নজরপুর : বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-বীরকুল পাকা রাস্তায় ২ মাইল (৩·২ কি. মি.) দক্ষিণে, বাগনান থানার অন্তর্গত নজরপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৭১)। একদা 'ঠেড়ুক' নামে পরিচিত এই গ্রামে মাটির খ'ড়ো ঘরে উপাসিত শ্রীবৃন্দাবনজীউ মহাপ্রভুর ৩' (৯২ সে. মি.) উচ্চতার দারুমূর্তিটি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। সেবায়তদের বিবরণে প্রকাশ, প্রায় চার শ বছর আগে বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে তাঁরই অন্যতম শিষ্য গঙ্গাবল্লভ গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকালে এখানে এসে উপস্থিত হন এবং স্থানটি মনোরম দেখে নিরালায় সাধনভজনের সুবিধার জন্য এক আশ্রম ও এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবালয়চত্বরে তাঁর প্রোথিত বকুল-ডালের দাঁতন-কাঠিটি থেকেই নাকি আজকের প্রাচীন বকুল গাছটির উদ্ভব। গাছটিতে ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না বলে সাধারণের কাছে সেটি 'সিদ্ধবকুল' নামে পরিচিত। গঙ্গাবল্লভ গোস্বামীর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী এই যে, স্থানীয় এক মুসলমান ভূস্বামী তাঁর দৈবশক্তি পরীক্ষার জন্য একটি ঢাকা পাত্রে গোমাংস রেখে তা আশ্রমে পাঠান। গঙ্গাবল্লভ সেটিকে নৈবেদ্যর পাত্র মনে করে পূজার ফুল ও জল ছিটিয়ে তা প্রসাদ হিসাবে ফেরৎ পাঠান। পাত্রের ঢাকা খুলে মুসলমান ভূস্বামী দেখেন, তাতে কেবল প্রসাদী ফুলই রয়েছে। অতঃপর এই বৈষ্ণব আখড়া তাঁর কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়। কাছাকাছি গ্রামের হরিনাম-সংকীর্তনে বৃন্দাবনচন্দ্রকে পালকি করে নিয়ে যাবার প্রাচীন রীতিটি এখনও প্রচলিত আছে। তাঁর পাকা দোলমঞ্চটি ১২৯২ বঙ্গাব্দের (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রচণ্ড ঝড়ে বিধ্বস্ত হলে, পরে সেটির সংস্কার করা হয়। সেবায়তদের কাছে রক্ষিত ১২০৯ বঙ্গাব্দের ২০০৮ নং তায়দাদে দেখা যায় যে, বর্ধমানরাজ 'ঠেড়ুক' গ্রামের এই বিগ্রহের

পূজার্চনার জন্য ৬৫ বিঘার কিছু বেশী জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছিলেন।

নবাসন : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের ঘোড়াঘাটা স্টেশনে নেমে, পাকা রাস্তায় ½ মাইল (০·৪ কি. মি.) উত্তরে এবং ৬ নং জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত বাগনান থানার এলাকাধীন টেঁপুর-নবাসন মৌজার অন্তর্ভুক্ত নবাসন গ্রাম (জে. এল. নং ৬২)। স্থানীয় 'আনন্দ-নিকেতন' প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত পুরাতত্ত্ব ও লোকশিল্পের মিউজিয়ম 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা' এ গ্রামের বিশিষ্ট সম্পদ। সেখানকার পুরাতত্ত্ব বিভাগে মৌর্য-শুঙ্গ যুগ থেকে পাল-সেন যুগ অবধি প্রাপ্ত বহু পোড়ামাটির মূর্তিকা ও ফলক, লিপিফলক, মৃৎপাত্র এবং নানাবিধ খেলনা-পুতুল সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন প্রস্তরভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধ, মহাবীর, বিষ্ণু, সূর্য, উমালিঙ্গন, মহিষমর্দিনী প্রভৃতির মূর্তি-সংগ্রহও এ মিউজিয়মের বিশেষ আকর্ষণ। এ ছাড়া ইটের মন্দিরসজ্জায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির দেবদেবীমূর্তি, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী কারিগর, সাহেব এবং জমিদারদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার দৃশ্য প্রভৃতির ফলকগুলিও খুবই চিত্তাকর্ষক। মৌর্য-শুঙ্গযুগ এবং পরবর্তী মোগল ও ব্রিটিশ আমলের বহু মুদ্রা এই সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য সম্পদ। 'সূত্রধর'-শিল্পীদের কাঠখোদাই কাজের নিদর্শনের মধ্যে আছে রথসজ্জায় ব্যবহৃত কাঠের নিরেট পুতুল, চণ্ডীমণ্ডপে উৎকীর্ণ নকাশি ও মূর্তি-অলংকরণ, কাঠের সিংহাসনে ব্যবহৃত শার্দূলমুখী বেষ্টনী, নানাবিধ দৈহিক ক্রীড়ারত নারী এবং শিবমন্দিরে উৎসৃষ্ট বৃষমূর্তি। লোকশিল্প বিভাগে দেখা যায় মাটি, কাঠ, গালা ও পিতলের নানান ধরণের পুতুল, জড়ানো ও চৌকো পট, চন্দ্রপুলি এবং আমসত্ত্বের ছাঁচ, নকশী-কাঁথা প্রভৃতি। প্রাচীন পুঁথির ছুটি চিত্রিত 'পাটা', দেড় শ'র বেশী বাংলা পুঁথি এবং বহু পুরানো দলিল-দস্তাবেজেও এই কীর্তিশালা সমৃদ্ধ। বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্যান্য দিন ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এই কীর্তিশালা সাধারণ দর্শকদের জন্য বিনা প্রবেশমূল্যে খোলা থাকে।

নাইকুলি : হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মুনশীরহাটে নেমে, 'মুলুকচাঁদের জাঙ্গাল' ধরে, কাঁচা রাস্তায় ½ মাইল (০·৮ কি. মি.) উত্তরে জগৎবল্লভপুর থানার নাইকুলি গ্রাম (জে. এল. নং ১১)। স্থানীয় বিশালাক্ষীতলায় পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী আটচালা শিবমন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। সেটির সম্মুখভাগে একদা কিছু পঙ্খের অলংকরণ ছিল। কিন্তু এখন তা বিনষ্ট। সামনের

দেওয়ালে পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ—"B. R. / সকাব্দ: / ১৬৯৫।" 'B. R.' অক্ষর দুটি চুনবালির পলস্তারার উপর ক্ষোদিত। স্থানীয় সংবাদে প্রকাশ, সম্ভবতঃ 'শুভমস্তু' এই শব্দযুক্ত প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ক্ষয়ে গেলে, এ দেবালয়ের সংস্কারকর্তা গ্রামের রায় পরিবারের জনৈক ব্যক্তির নামের ইংরেজী আদ্যাক্ষর সে স্থান পূরণ করেছে। দৈর্ঘ্যে ১০' ৮" (৩.৩ মি.), প্রস্থে ১০' ৫" (৩.২ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি), এ মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

এ দেবালয়ের পাশে দক্ষিণমুখী এক দালান-মন্দিরে প্রায় ৫' (১.৫ মি.) উঁচু, নিমকাঠের প্রাচীন বিশালাক্ষীমূর্তিটি খুবই অভিনব। খড়্গ ও খেটকধারিণী, দণ্ডায়মানা দেবীর এক পা কালভৈরবের বুকের উপর এবং অন্য পা বটুকভৈরবের মাথার উপর স্থাপিত। অনুসন্ধানে প্রকাশ, ১২০৯ বঙ্গাব্দে স্থানীয় মিশ্র পরিবারের রাধাকান্ত ও রাধাকৃষ্ণ নামের দু ভাই এই বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। হাওড়া জেলায় একদা বহু কাঠখোদাই-শিল্পী কাজ করতেন। সেজন্য এ জেলায় বেশ কয়েকটি কাঠের বিগ্রহ এখনও উপাসিত। তাদের মধ্যে নাইকুলির এই দেবীমূর্তিটি নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর।

নার্না: হাওড়া-ডোমজুড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডোমজুড়ে পৌঁছে, কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৪ মাইল (৬.৪ কি. মি.) উত্তরে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত নার্না গ্রাম (জে. এল. নং ৪০)। গ্রামের পুব প্রান্তে অবস্থিত দালান-রীতির কালীমন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হলেও পাথরের বিগ্রহটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের একাধিক লিপিফলকের মধ্যে কালোপাথরে ক্ষোদিত পাঁচ পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়:— / শ্রীরামনারায়ণ মল্লিক / সাং কলিকাতা / সন ১২১৪ সাল / সকাব্দা ১৭২৯।" রামনারায়ণ মল্লিক শুধু এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, নিজবালিয়া গ্রামের সিংহবাহিনী মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমণ্ডপ নির্মাণেও তিনি যে উদ্‌যোগী ছিলেন ('নিজবালিয়া' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) তা সেখানকার লিপিফলকেই প্রমাণ। আলোচ্য মন্দিরের কালীমূর্তিটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিবের বুকে দণ্ডায়মানা দেবীর ডান দিকে লক্ষ্মী, গণেশ ও জয়া এবং বাম দিকে সরস্বতী, কার্তিক ও বিজয়া। বিগ্রহের চালচিত্রে 'রিলিফ'-খোদাই করে উৎকীর্ণ হয়েছে দুর্গার বিভিন্ন রূপ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রামচন্দ্র প্রমুখের মূর্তি। পাদপীঠে উৎকীর্ণ

এক লাইনের লিপিটির পাঠ—"শিল্পী শ্রীগোকুলবিহারী ভাস্কর, সাং কাটোয়া।" 'কাটোয়া' বর্ধমান জেলার এক মহকুমা-শহর। সেখানকার পাথরখোদাই-শিল্পীরা এখন নিশ্চিহ্ন হলেও অদূরের দাঁইহাট শহরে 'ভাস্কর' উপাধিধারী কয়েক ঘর শিল্পী এখনও বংশগত পেশায় নিযুক্ত আছেন। কাছাকাছি গ্রাম পাতুন-এ কিছুকাল আগেও এ শিল্পের চর্চা ছিল। ('দেখা হয় নাই' : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা : ১৩৮০। পৃ: ১৯১-৯৫)।

পঞ্চানন্দ এখানকার এক বিখ্যাত লৌকিক দেবতা। তিনি ঘটে প্রতিষ্ঠিত। রোগ নিরাময়ের দেবতা হিসাবে দূরব্যাপী খ্যাতির জন্য হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, ২৪-পরগণা ও কলকাতা থেকে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। চৈত্রসংক্রান্তিতে পঞ্চানন্দের গাজন উপলক্ষে একটি বড় মেলা বসে।

নারিকেলবেড়িয়া : 'কল্যাণচক' নিবন্ধে নারিকেলবেড়িয়ায় পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত এ গ্রামের (জে. এল. নং ১৭০) একমাত্র পুরাকীর্তি—অধিকারীপাড়ায় অবস্থিত শালগ্রামরূপী লক্ষ্মীনারায়ণজীউর ইটের, পশ্চিমমুখী, পঞ্চরথ শিখর-দেউল। পাট ও গুড়ের ব্যবসায়ে একদা বিত্তবান অধিকারী পরিবারের এ মন্দিরে কোন 'টেরাকোটা'-সজ্জা নেই। সামনের দেওয়ালে চুনবালির পলস্তারার উপর ক্ষোদিত কিছু ফুল-লতা-পাতার নকশা দেখা যায়। প্রবেশপথের উপরে একটি ছোট কুলুঙ্গিতে পাথের গণেশমূর্তি এবং দক্ষিণের দেওয়ালে অনুরূপভাবে স্থাপিত শিবমূর্তিটি লক্ষণীয়। মন্দিরলিপি থেকে জানা যায়, সেটি ১১৩৯ বঙ্গাব্দে (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত। শিখর-মন্দিরের প্রথাগত নির্মাণরীতি অনুসারে এ দেবালয়ের ভিতরের পরিসর বর্গাকার না হয়ে অষ্টকোণাকৃতি এবং ছাদ দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। চতুর্দিকের উদ্গত অংশ বাদে, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ৭' ৩" (২.২ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি.)।

নিজবালিয়া : 'ইছাপুর' নিবন্ধে নিজবালিয়ায় পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জগৎবল্লভপুর থানার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম নিজবালিয়া (জে. এল. নং ৪৬)। দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। দক্ষিণমুখী, আটচালা মন্দিরটির সামনে একটি চারচালা দালান সংযুক্ত। অলংকরণহীন এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের গঠনস্থাপত্য অভিনিবেশযোগ্য। দেওয়ালের ৩' (৯২ সে. মি.) উচ্চতা থেকেই

লহরানির্মাণ শুরু করে তার উপর গম্বুজনির্ভর ছাদ স্থাপন করা হয়েছে। চারচালা দালানটির ছাদ চার ধার থেকে উন্নীত কুম্ভপৃষ্ঠ খিলান ('কোভ ডোম') দ্বারা নির্মিত। গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য ২০' ৩" (৬.২ মি.), প্রস্থ ১৯' ৯" (৬ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ৪০' (১২.২ মি.)। দালানের দৈর্ঘ্য ২০' ৩" (৬.২ মি.), প্রস্থ ১০' (৩.১ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। এ দেবালয়ের সামনে চাঁদনী-রীতির যে নাটমণ্ডপটি আছে তার প্রবেশপথের উপরে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ চার পঙ্‌ক্তির লিপিটির পাঠ—"শ্রীরামনারায়ণ মল্লিক/সাং কলিকাতা সকাবদা/১৭১২। সন ১১৯৭ সাল/মাহ অগ্রহায়ণ।" স্থানীয় ব্যক্তিদের ধারণা, নাটমন্দিরে নিবদ্ধ এ লিপিটি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেটিরই প্রতিষ্ঠাসূচক; মূল মন্দিরটি নাকি তার বহু পূর্বের। কিন্তু স্থাপত্য-শৈলীর বিচারে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। অতএব, কলকাতার রামনারায়ণ মল্লিকই গোটা মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন মনে হয়। বিগ্রহ অষ্টভুজা সিংহবাহিনীমূর্তিটি কাঠের। কিন্তু দেবীর বাঁ পাশে প্রায় ৩' (৯২ সে. মি.) উঁচু কষ্টিপাথরের একটি অক্ষত বাসুদেবমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটির পশ্চাৎপটে কীর্তিমুখ এবং তার নীচে, মূর্তির ডান দিকে, 'বা রিলিফে' নৃসিংহ, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ ও বামন এবং বাঁ দিকে তিন রাম, বুদ্ধ ও কল্কির মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। নীচে, ডান পাশে, বীণাবাদিনী সরস্বতী, বাম পাশে চৌরী ও কমলধারী লক্ষ্মী এবং পদতলে জোড়হস্তে গরুড়। আনুমানিক এগারো শতকের এমন একটি সুগঠিত, পূর্ণাবয়ব মূর্তির নিদর্শন হাওড়া জেলায় একান্তই বিরল।

এ মন্দিরের অল্প দক্ষিণে, 'টেরাকোটা'-অলংকৃত, অলিন্দযুক্ত, দক্ষিণ-মুখী এক আটচালা শিবমন্দিরের খিলানশীর্ষে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য উৎকীর্ণ। সেটিতে নিহত রাক্ষসদের মৃতদেহ ভক্ষণরত শকুনির দল এক অভিনব সংযোজন। পাদমূলে, অনুভূমিক সারিতে, ফুল-লতা-পাতার অলংকরণ এবং খাড়াভাবে সন্নিবিষ্ট কিছু ফলকে সাহেব-মেমের মূর্তি দেখা যায়। 'টেরাকোটা'-সজ্জার অন্যান্য বিষয়বস্তু- মহন্ত সম্প্রদায়, কালী এবং নর্তকী প্রভৃতির মূর্তি। দৈর্ঘ্যে ১৪' ৫" (৪.৪ মি.), প্রস্থে ১৩' ১" (৪ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ৩০' (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ পুব-পশ্চিমে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরা-নির্ভর গম্বুজের উপর রক্ষিত। দালানের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা নির্মিত। সামনের দেওয়ালে, কার্নিসের নীচে, পোড়ামাটির ফলকে যে এক পঙ্‌ক্তির লিপিটি আছে তার পাঠ—"শ্রীশ্রীরাম শুভমস্তু সকাবদা ১৬৯৮ সক সন ১১৮৩ সাল তাং ১৫ শ্রাবণ।" ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে

নির্মিত এই মূল্যবান পুরাকীর্তিটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে।

সিংহবাহিনী মন্দিরের উত্তর-পূর্বে, বালিয়াবাজার এলাকায়, স্বয়ম্ভু-শিব 'পিপুলেশ্বর'এর পশ্চিমমুখী এক সপ্তরথ শিখর-দেউল দেখা যায়। তার ভিতরের গড়ন কিন্তু আটকোণা এবং গর্ভগৃহের ছাদ দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯' ১০" (২'৯ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২৫' (৭'৬ মি.), এ দেবালয়টি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন না হলেও তার অভিনব স্থাপত্যের জন্য উল্লেখযোগ্য।

গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত আর একটি পশ্চিমমুখী আটচালা শিবমন্দির আছে। সেটির প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির ফুল-লতা-পাতা এবং উল্লম্ব ও অনুভূমিকভাবে নিবদ্ধ দু সারি প্রস্ফুটিত পদ্ম নিপুণ কারিগরির পরিচায়ক। কোন লিপিফলক না থাকলেও স্থাপত্যভাস্কর্যের নিরিখে এটি যে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত এমনই মনে হয়। মন্দিরটির ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১০' ৬" (৩'২ মি.), প্রস্থে ৯' ৯" (২'৯ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬'১ মি.), এই মূল্যবান পুরাকীর্তিটি সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে এতই জীর্ণ হয়েছে যে, অচিরেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে।

'নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার'-এর পক্ষ থেকে স্থানীয় এক সংগ্রহ-শালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেসব পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে আছে মন্দিরসজ্জায় ব্যবহৃত অনেকগুলি 'টেরাকোটা'-ফলক ও মূর্তি এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রাদি।

নিমাবালিয়া : 'ইছাপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইছাপুরের সংলগ্ন দক্ষিণের গ্রাম নিমাবালিয়া (থানা—জগৎবল্লভপুর : জে. এল. নং ৪২)। 'বুড়োশিবে'র একটি পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। তার গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ ছাড়াও প্রায় ৩' (৯২ সে. মি.) উচ্চতার এক কাঠের হরপার্বতীমূর্তি রক্ষিত আছে। প্রবেশপথের উপরে একদা কতকগুলি সুন্দর 'টেরাকোটা'-পদ্ম ছিল। কিন্তু সংস্কারের নামে চুনকাম করায় সেগুলি নষ্ট হতে চলেছে। দৈর্ঘ্যে ১৩' ৭" (৪'২ মি.), প্রস্থে ১১' ১০" (৩'৬ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৩০' (৯'২ মি), এ দেবালয়ের

ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। এ মন্দিরে কোন লিপিফলক নেই বটে, তবে স্থাপত্যভাস্কর্যের নিরিখে এটিকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

ঘুনেবাড়: 'দেউলী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেউলীর সংলগ্ন দক্ষিণের গ্রাম ঘুনেবাড় (থানা শ্যামপুর: জে. এল. নং ৮৬)। স্থানীয় পঞ্চানন্দ-মন্দিরের বিগ্রহ কষ্টিপাথরের একটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির উপরের অংশ —যার বর্তমান উচ্চতা প্রায় ২২ʹ (৭৬ সে. মি.)। শিল্পশৈলীর বিচারে, এটি খ্রীষ্টীয় বারো বা তেরো শতকের বলে অনুমিত হয়। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, ১৩০০ বঙ্গাব্দে ঘুনেবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর দিকের পুষ্করিণী খননকালে এই পল্লী-নিবাসী ৺ভজহরি সামন্ত মূর্তিটি পান এবং পরে তাঁর স্ত্রী সুন্দরীবালা সামন্ত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেটিকে পঞ্চানন্দরূপে এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্প্রতি স্থানীয় গোপীবল্লভ সামন্তের পুষ্করিণী খননকালে মাটির তলায় থাকবন্দভাবে ১ʹ ৩ʺ × ১০ʺ × ২২ʺ (৩৮ × ২৫ × ৬ সে. মি.) মাপের বহু ইট পাওয়া গিয়েছে, যেগুলির এক ধারে একটি সরু কাঠের গুঁড়ি এবং সেটিকে আটকে রাখবার জন্য দু পাশে দুটি কাঠের গোঁজ মাটিতে পোঁতা অবস্থায় দেখা যায়। অতি প্রাচীন এসব পুরাবস্তুর আবিষ্কারে প্রতীতি হয়, তমলুকের অদূরে রূপনারায়ণ নদের অপরতীরবর্তী এই এলাকা হয়ত প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে সম্ভাবনাময়।

পাইকপাড়া: 'গৌরাঙ্গচক' নিবন্ধে মুনশীরহাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) দক্ষিণ-পূর্বে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রাম (জে. এল. নং ২৪)। কানা নদীর তীরে শিবতলায়, স্থানীয় সরকার পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বুড়োশিবে'র পশ্চিমমুখী, একদ্বারী, আটচালা মন্দিরটি স্থানীয় একমাত্র পুরাকীর্তি। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, মন্দিরের সামনের দেওয়ালে, কার্নিসের নীচে, কাঠের তক্তার উপর খোদাই-করা যে প্রতিষ্ঠাফলকে ১২৫০ বঙ্গাব্দ প্রতিষ্ঠা-সন হিসাবে উল্লিখিত ছিল সেটি এখন বিনষ্ট। তবে স্থাপত্যের নিরিখে মন্দিরটিকে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১ʹ (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫ʹ (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

পাতিহাল : হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুন্সীরহাট হয়ে নিয়মিত বাস চলে) পাতিহালে নেমে, কাঁচা রাস্তায় ১½ মাইল (২.৪ কি.মি.) পশ্চিমে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পাতিহাল গ্রাম (জে. এল. নং ৪৯)। আগে হাওড়া-আমতা ছোট রেলের একটি স্টেশনও এখানে ছিল। গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি—বিভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত কতকগুলি মন্দির ও রাসমঞ্চ। মজুমদারপাড়ার মন্দিরতলা এলাকায় পূর্ব ও পশ্চিমমুখী সামনাসামনি দুটি একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির আছে। পুবমুখী প্রথমটিতে কোন পোড়ামাটির অলংকরণ না থাকলেও সেটির প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালে ইতস্ততঃভাবে কতকগুলি 'টেরাকোটা'-পদ্ম দেখা যায়। কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ লিপিফলকটির পাঠ—"সকাব্দা ১৭০৩ সক ১১৮৮ সাল।" ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১২′ ১০″ (৩.৯ মি.), প্রস্থে ১১′ ৭″ (৩.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.)। উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসহ মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

পশ্চিমমুখী দ্বিতীয় মন্দিরটি খুবই জীর্ণ। দৈর্ঘ্যে ১২′ (৩.৭ মি.), প্রস্থে ১১′ (৩.৪ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। এটিতে কোন লিপি-ফলক নেই। কিন্তু এ দুটি মন্দির আঠারো শতকের মাঝামাঝি একই সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়।

মন্দিরতলার সামান্য উত্তরে মজুমদার পরিবারের পুবমুখী, পঞ্চরত্ন মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। তার প্রবেশপথের উপরে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যে কিছু অভিনবত্ব আছে। কেন না, প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রমস্বরূপ, সেখানে রাম ও রাবণকে মুখোমুখি স্থাপন করা হয়নি। এই মূল প্যানেলের দু পাশে বহু ছোট-বড় পদ্ম-ফলক বসিয়ে অলংকরণের মধ্যে একটা সমতা আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। মন্দির-পাদমূলে প্রথাগত সামাজিক দৃশ্যের বদলে নকাশি সজ্জা দেখা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ ৬″ (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৩৫′ (১০.৭ মি.), এ দেবালয়ের দক্ষিণ দিকে আর একটি প্রবেশপথ আছে এবং এটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। লিপিফলকের অভাবে, স্থাপত্যভাস্কর্যের নিরিখে, মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষ ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

সাহাপাড়ায় মণ্ডল পরিবারের প্রায় ২০′ (৬.১ মি.) উচ্চতার একটি আটকোণা রাসমঞ্চ আছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত এ পুরাকীর্তির প্রতি কোণে প্রায় ৩′ (৯২ সে.মি.) উচ্চতার যে নিরেট 'টেরকোটা'-মূর্তিগুলি ছিল তা এখন অপহৃত। এ পাড়ার 'বাঘমুখো বাড়ি'র দক্ষিণে একই পরিবারের নয়-চূড়াযুক্ত আর একটি আটকোণা রাসমঞ্চ আছে। চূড়াগুলি খাঁজকাটা শিখর-দেউলের অনুকরণে নির্মিত এবং ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর রক্ষিত। এ রাসমঞ্চটিতেও প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, পারিবারিক ইতিহাস ও স্থাপত্যশৈলীর বিচারে, এটিকে একই সময়ের বলে মনে হয়। এ ছাড়া সাহাপাড়ায় সীতারাম সাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরও একটি আটকোণা রাসমঞ্চ আছে।

গ্রামের 'মণ্ডলা'য় (মহেশতলায়) চক্রবর্তী পরিবারের গৃহদেবতা কালীনাথজীউর এক দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দির দেখা যায়। সেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৬″ (৩.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি.)। পারিবারিক বিবরণে প্রকাশ, মন্দিরটি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত।

রায়পাড়ায় রায় পরিবারের শ্যামসুন্দরজীউর আটচালা-রীতির দোলমঞ্চটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার চারদিক খোলা এবং ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। দৈর্ঘ্যে ৭′ ১১″ (২·৪ মি.), প্রস্থে ৭′ ৯″ (২.৩ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫′ (৪.৬ মি.), এ পুরাকীর্তির শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ—"শ্রীরামসদয় রায় / সন ১২৭৪ সাল।" অতএব, রায় পরিবারের রামসদয় রায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করান।

গ্রামের দক্ষিণে 'নস্কর দীঘি' নামে এক প্রাচীন দীঘির নামকরণ সম্বন্ধে জনশ্রুতি—একদা এক বাগদী রাজা লোকলস্কর নিয়ে এ জলাশয়ের চতুর্দিকে বসবাস করার কারণেই দীঘির নাম হয়েছে নস্কর দীঘি। কয়েক বছর আগে এটির পঙ্কোদ্ধারের সময় একটি বাঁধানো ঘাটের ও ১৩″ × ৭″ × ৩″ (৩৩ × ১৮ × ৭ সে. মি.) মাপের বড় ইটের নাকি সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

পানশিলা : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) হোগলাসি-তে নেমে, কাঁচা রাস্তায় প্রায় ১ মাইল (১·৬ কি. মি.) পশ্চিমে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত পানশিলা গ্রাম (জে. এল. নং ৬৯)। স্থানীয়

'গঙ্গাধর' শিবের দক্ষিণমুখী. একদুয়ারী একটি আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। সেটিতে কোন পোড়ামাটির অলংকরণ বা লিপিফলক নেই। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, স্থানীয় কুম্ভকার সম্প্রদায়ের জনৈক ভজহরি পাল বিষয়সম্পত্তি ও জমিদারির আয়ে ধনশালী হয়ে শতাধিক বৎসর পূর্বে এ দেবালয়টি নির্মাণ করিয়ে দেন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' ৬" (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.), এ মন্দিরটির উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসহ গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর গম্বুজ দিয়ে নির্মিত। সংরক্ষণের অভাবে লোনাধরা দেওয়ালগুলি এতই জীর্ণ হয়েছে যে, যেকোন দিন এটি ভেঙ্গে পড়তে পারে।

পারগুস্তিয়া : হাওড়া-জালালসি পিচের সড়কে (মুন্সীরহাট হয়ে নিয়মিত বাস চলে), পথের পাশেই জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত জালালসি মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ৭৩) পারগুস্তিয়া গ্রাম। আগে হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে জালালসিতে একটি স্টেশনও ছিল। প্রতিষ্ঠালিপিযুক্ত, পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী একটি আটচালা শিবমন্দির এখানকার উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। স্থানীয় আদক পরিবারের অলংকরণবিহীন এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ পাঁচ পঙ্‌ক্তির ক্ষয়িত 'টেরাকোটা'-লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "সকা ১৭৪৯ / সন ১২৩৪ সা....../ তারিখ...... ...২/ রচত্র দেবালয়ং / রামহরি স্বপথং।" প্রায় ৫' (১.৫ মি.) উঁচু ভিত্তি-বেদীর উপর স্থাপিত মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৪' (৪.৩ মি.), প্রস্থে ১২' ৬" (৩.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। গর্ভগৃহের ছাদ পূব-পশ্চিমে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

পিচ রাস্তার পাশে, বাঁধানো চাতালের উপর, পাথরের যে বিরাট খণ্ডটি 'জলেশ্বরদেব' নামে পূজিত, তা কোন প্রাচীন মন্দিরের অঙ্গ বলে মনে হয়। (এ বিষয়ে 'পোলগুস্তিয়া' নিবন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)।

পিছলদহ : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কমলপুরে পৌঁছে, কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৩½ মাইল (৫.৬ কি. মি.) দক্ষিণ-পুবে, শ্যামপুর থানার অন্তর্গত পিছলদহ গ্রাম (জে. এল. নং ১০২)। ডি-ব্যারোজের মানচিত্রে (১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ) 'পিসলতা' এবং গ্যাস্টলডির ম্যাপে (১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ) 'পিকল্দা' নামে এ পল্লীর উল্লেখ তার এককালীন গুরুত্বের প্রমাণ। তা ছাড়া কিংবদন্তী, চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে এখানে আড়াই দণ্ডকাল

বিশ্রাম করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলায় বলা হয়েছে যে, তিনি পানিহাটি থেকে নদীপথে আলোচ্য পিছলদায় আসেন যদিও অন্যান্য বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মতে গ্রামটি আসলে মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কাছাকাছি অবস্থিত। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত: "খৃষ্টের জন্মের চৌদ্দ শত কি পনের শত বৎসর পরে যে সকল মনসার ও চণ্ডীর গান পাওয়া যায়, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। সে সময় লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত।" এখানে একই স্থানে বর্ধিত একটি বট, অশ্বথ ও তমাল তরুতল চৈতন্যদেবের পাদস্পর্শে পবিত্র বলে চিহ্নিত। সেখানে এখন পোড়ামাটির মুণ্ডরূপে দক্ষিণরায় নামে পূজিত ১½' (৪৬ সে. মি.) উচ্চতার দেবতাটি বেশ অভিনব। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে এই দেবতার বার্ষিক উৎসব হয়।

এখানকার মুখোপাধ্যায় পরিবারের বারাহীচণ্ডীর পাথরের মূর্তিটি সম্ভবত: মস্তকবিহীন প্রাচীন এক নৃসিংহমূর্তি, ভাস্কর্যশৈলীর নিরিখে যেটিকে পালযুগের বলে সনাক্ত করা চলে। দেবীর কক্ষের বাইরের চত্বরে ভাস্কর্যযুক্ত পাথরের যে চৌকা খণ্ডটি পড়ে আছে তা দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেটি আদিতে কোন পাথরের মন্দিরের অঙ্গ ছিল। সেবায়ত মুখোপাধ্যায় পরিবারের পুষ্করিণী খননের সময় একদা নাকি ইটের এক দীর্ঘ প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছিল। সমস্ত স্থানটি এখনও প্রাচীন খোলামকুচিতে পূর্ণ। এখানে উৎখনন চালালে আরও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে।

পেঁড়ো: 'গৌরাঙ্গচক' নিবন্ধে মুনশীরহাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে মুনশীরহাট-পেঁড়ো পিচের সড়কে (ট্যাক্সি চলে) উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত পার-রাধানগর মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ১৭৬) পেঁড়ো গ্রাম। আঠারো শতকের প্রখ্যাত বাঙালী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁরই জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিবমন্দির এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। দক্ষিণমুখী, পাশাপাশি দুটি মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমেরটি 'যজ্ঞেশ্বর' শিবের দালান-রীতির দেবালয়। পুব পাশের একদুয়ারী, আট-চালা মন্দিরটি 'বিশ্বেশ্বর' শিবের এবং তার প্রবেশপথের উপরে লঙ্কাযুদ্ধের 'টেরাকোটা'-অলংকরণ বর্তমান। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ: "শুভ-মস্তু/সাকাব্দা ১৭১৩/শ্রীলালবিহারি রায়স্য কীর্ত্তি মিস্ত্রী।" ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয় দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' ৪" (৩.৮ মি.) এবং উচ্চতায়

প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। তৃতীয়, পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী আটচালা মন্দিরটি 'হরিশ্বর' শিবের। তার সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য ও কিছু প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১২' ৬" (৩.৮ মি.), প্রস্থে ১১' ৮" (৩.৬ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। প্রবেশ-পথের উপরে পোড়ামাটির আংশিক ক্ষয়িত লিপিটি নিম্নরূপ: "শুভমস্তু সকাব্দা / ১৭৪১ গ্রাম ভিক্ষা / ন······ঠাকুরাণি / শ্রীনিলাম্বর মিস্ত্রী : । / সন ১২২৬ সাল ১৪ জৈষ্ঠ।" অতএব, ইংরেজী সাল অনুসারে, এ দেবালয়টি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। উল্লিখিত তিনটি আটচালা মন্দিরেরই গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

ভারতচন্দ্রের কালে রায় পরিবারের শরিকদের ভদ্রাসনগুলি গড়খাইবেষ্টিত ছিল। সে খাতের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এই 'গড়বাড়ি'র পুবের-বাড়ি এলাকায়, চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুবমুখী, পঞ্চরথ শিখর-দেউলটি এখানকার আর এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। বিগ্রহ শ্রীধরজীউ (শালগ্রাম) ও 'রামেশ্বর' শিব। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে, বরণ্ডের নীচে, এক জানালার ঠিক উপরে, 'টেরাকোটা'-অলংকরণগুলি নিবদ্ধ। বিষয়বস্তু—রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ, বৃষবাহন শিব, সিংহবাহিনী, হনুমান, লাঠিধারী প্রহরী প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ—"সকাবদা ১৭৬৮/সন ১২৫৩ বারস/ও তিপান্ন সাল/শ্রীবৈদ্যনাথ রায় / শ্রীপাঁচু মিস্ত্রী।" ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরের কারিগর পাঁচু মিস্ত্রীর নিবাস উল্লিখিত না হলেও তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ-চকের ('কল্যাণচক' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) ধাড়ী পরিবারের আটচালা মন্দিরটির স্থপতি পঞ্চানন মিস্ত্রী সম্ভবত: এই পাঁচু মিস্ত্রী। সেখানকার গ্রামবৃদ্ধদের মতে, পঞ্চানন মিস্ত্রীর নিবাস ছিল হুগলী জেলার রাজহাটি-নন্দনপুরে। সেকালের একই কারিগর নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকার মন্দির নির্মাণে যে পারদর্শী ছিলেন তার আরও সমর্থন মেলে মেদিনীপুর জেলার দাসপুর এলাকার স্থপতি ঠাকুরদাস শীলের ক্ষেত্রে। ['বাংলার মন্দির: মন্দিরগড়া স্থপতিদের ঠিকানা' (প্রবন্ধ): তারাপদ সাঁতরা। 'চতুষ্কোণ' মাসিক পত্রিকা: ফাল্গুন, ১৩৭৬]। এ দেবালয়ের দক্ষিণ দেওয়ালে পোড়ামাটির লিপি ছাড়াও পুব দিকের প্রবেশপথের উপরে পাশাপাশি যে দুটি শ্বেতপাথরের লিপি দেখা যায়, তা পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় নিবদ্ধ হয়েছে মনে হয়। সে দুটির পাঠ—(প্রথমটি) "বৈদ্যনাথ রায় / স্থাপিত ১২৫৩ / পাঁড়ুয়া গড়বাটী / হাওড়া" এবং (দ্বিতীয়টি)

"শ্রীঅটলবিহারী চট্টোপাধ্যায় / শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী।" এই শিখর-দেউলের ছাদও চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৩″ (৩.৮ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.)।

পোলগুস্তিয়া : হাওড়া-জালালসি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জালালসিতে নেমে, ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) দক্ষিণে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পোলগুস্তিয়া গ্রাম (জে. এল. নং ৭২)। স্থানীয় তেলীপুকুর-পঞ্চাননতলায় কুণ্ডু পরিবারের একটি পরিত্যক্ত, একদুয়ারী, আটচালা মন্দির এবং বারোয়ারিতলায় আর একটি একদুয়ারী, আট-চালা শিবমন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। দুটি দেবালয়ই পশ্চিমমুখী। প্রথম মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে চুনবালির পলস্তারার উপর প্রতিষ্ঠালিপিটি বর্তমানে বিনষ্ট হলেও স্থাপত্যের নিরিখে সেটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ ৬″ (৩.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

বারোয়ারিতলার মন্দিরটিতে এখনও পূজার্চনা চলে। স্বয়ম্ভু শিব-লিঙ্গটি কোন মন্দির থেকে আহৃত এক পাথরের স্তম্ভ হতে পারে। এ দেবালয়ে কোন লিপিফলক না থাকলেও এটি যে অন্য মন্দিরটির সমসাময়িক তাতে সন্দেহ নেই। দৈর্ঘ্যে ১৫′ ৪″ (৪.৭ মি.), প্রস্থে ১৩′ ১০″ (৪.৩ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ৩০′ (৯.২ মি.), এ মন্দিরের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসমেত চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। বিগ্রহ উপাসিত হলেও মন্দিরটির ছাদ বর্তমানে আগাছাসমাকীর্ণ।

এ দুটি মন্দির ছাড়া, গ্রামপ্রান্তে পূর্বতন মার্টিন-রেলপথের পাশা-পাশি পিচ রাস্তার ধারে, খোলা আকাশের নীচে এক বাঁধানো চত্বরে 'মগরাই চণ্ডী'জ্ঞানে পূজিত দুটি পাথরের স্তম্ভ অভিনিবেশযোগ্য। আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে প্রাচীন কোন মন্দিরের অঙ্গশিখর বলে মনে হয়। 'মগরাই চণ্ডী'র থানের বিপরীত দিকে, রাস্তার ওপারে, বাঁধানো বেদীতে প্রতিষ্ঠিত বিরাট এক প্রস্তরখণ্ড 'জলেশ্বরদেব' হিসাবে উপাসিত। গ্রামবৃদ্ধদের বিবরণে প্রকাশ, সেটি অদূরের এক ডোবা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পোলগুস্তিয়ার বারোয়ারিতলার স্তম্ভাকৃতি শিবলিঙ্গটি এবং এখানকার এসব পাথরের খণ্ডগুলি দেখে মনে হয়, কানা নদীর তীরবর্তী এ এলাকায় এগারো-বারো শতকে হয়ত পাথরের

কোন প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। কাছাকাছি গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তিগুলি এ অনুমানই সমর্থন করে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ছাড়া এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন।

প্রতাপপুর : 'নিজবালিয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিজবালিয়ার সংলগ্ন পশ্চিমে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত, প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটি মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ২৩) গ্রাম প্রতাপপুর। স্থানীয় ধর্মতলায় একটি একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত, অলংকরণহীন, দক্ষিণমুখী এ দেবালয়টি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও স্থাপত্যের নিরিখে এটি যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। দৈর্ঘ্যে ১১' ৬" (৩.৬ মি.), প্রস্থে ১১' (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২২' (৬.৭ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

বড়গাছিয়া : হাওড়া-মুন্সীরহাট পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) পাশে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বড়গাছিয়া গ্রাম (জে. এল. নং ৫১)। স্থানীয় ধর্মতলায় ধর্মরাজ ঠাকুরের দক্ষিণমুখী একটি একদুয়ারী, আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। অলংকরণবিহীন এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রায় ৫' (১.৫ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১২' (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। লিপিফলকের অভাবে গ্রামবৃদ্ধদের মতে ও স্থাপত্য বিচারে, এটি উনিশ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

বরদাবাড় : 'ডিহি-মণ্ডলঘাট' নিবন্ধে বরদাবাড়ে পৌঁছবার পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্যামপুর থানার অন্তর্গত অযোধ্যা মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ৭১) গ্রাম বরদাবাড়। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি— ছাউলে ও আদক পরিবারের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনজীউর মন্দিরের দরজায় ব্যবহৃত নকাশি কাঠের কপাট। কাঠখোদাইয়ের এত সুন্দর নিদর্শন বিরল। একদা হাওড়া জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে যে বহু সুদক্ষ দারুতক্ষণশিল্পী বাস করতেন, এই মনোরম পুরাকীর্তিগুলি তার অন্যতম প্রমাণ। ছাউলে পরিবারের মন্দিরটির দেওয়াল মাটির ও চাল টালির। মন্দিরস্থাপত্যের দিক থেকে তার কোনই গুরুত্ব নেই। কিন্তু দক্ষিণ ও পুবের দরজার কাঠের কপাট এবং খুঁটিগুলিতে প্রধানতঃ যে কৃষ্ণলীলার

দৃশ্য, পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ও কিছু ফুল-লতা-পাতার অলংকরণ দেখা যায় তা খুবই উচ্চ শ্রেণীর।

আদক পরিবারের মন্দিরটিরও মাটির ঘর এবং টালির চাল। এ দেবালয়ের একমাত্র প্রবেশপথের দরজায় কাঠখোদাইয়ের বিষয়বস্তু—কৃষ্ণলীলার নানান দৃশ্য এবং পৌরাণিক দেবদেবী। এগুলিও অতি উচ্চ মানের।

মন্দির দুটির সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল অজ্ঞাত। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় ছাউলে পরিবার তাদের প্রচুর চাল দিয়ে সাহায্য করায় তাদের আগেকার 'হৃদাতী' পদবী পরিবর্তিত হয়ে 'ছাউলে' হয় এবং আদকরা আধ-ঘড়া ঘি দিয়েছিলেন বলে তাঁদের নতুন উপাধি হয় 'আদক'। মনে হয়, বর্গীর হাঙ্গামার পরবর্তীকালে দুই পরিবারের আর্থিক উন্নতির সূত্রপাত। অতএব, আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ পুরাকীর্তি দুটি নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

বরুইপুর : 'গৌরাঙ্গচক' নিবন্ধে খিলায় পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খিলার হাট থেকে কাঁচা রাস্তায় ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) উত্তরে, উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত খিলা মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ১৭১) বরুইপুর গ্রাম। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি মাজীপাড়ায় মাজী পরিবারের 'রঘুনাথ' শিবের পুবমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দির। এটি হাওড়া জেলায় সতেরো শতকের অল্প কয়েকটি মন্দিরের অন্যতম হওয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দৈর্ঘ্যে ১৫′ ৮″ (৪.৮ মি.), প্রস্থে ১৩′ ৮″ (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসমেত চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। সামনের কার্নিসের উপর প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ— "শুভমস্তু / শকাব্দা ১৬১৬।" মন্দিরটির সম্মুখভাগে একদা যে প্রচুর পোড়ামাটির অলংকরণ ছিল তা অবশিষ্ট ফলকগুলির বিন্যাসরীতি দেখলেই বোঝা যায়। সেগুলির প্রধান বিষয়বস্তু—মহন্তদের বিভিন্ন ভঙ্গি ও নানান নারীমূর্তি। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এসব 'টেরাকোটা'-ভাস্কর্যে সে যুগের উচ্চ নৈপুণ্য বিধৃত। স্বর্গত ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন রচিত বাংলার মন্দির সম্বন্ধে আকর-গ্রন্থ Late Mediaeval Temples of Bengal থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি এখানে প্রাসঙ্গিক : "The terracotta art is at its liveliest in the 17th century, loses a good deal of its rhythm in the 18th, briefly revives under the

influence of European realism in the 19th, but otherwise peters out in degenerate forms." (পৃঃ ১৪)।

নন্দীপাড়ার নন্দী পরিবারের পাশাপাশি স্থাপিত, লিপিযুক্ত, পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী দুটি আটচালা মন্দির ও একটি শিখর-দেউলও এ গ্রামের উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। একদা লবণ ব্যবসায়ে বিত্তবান নন্দী পরিবারের রামচন্দ্র নন্দী এই তিনটি দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তরের আটচালা মন্দিরটি 'বিশ্বেশ্বর' শিবের। সেটির প্রবেশপথের উপরে চুনবালির পলস্তারায় উৎকীর্ণ তিন পঙ্‌ক্তির ক্ষয়িত প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ – "শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর সেবাত শ্রীযুত রামচন্দ্র নন্দী পং ভূরসিষ্ট সাং /…… ………/ শুভমস্তু সকাব্দা………৬৩ সন ১২৪৮ সাল শ্রীরামগোপাল মিস্ত্রারি সাং আটপুর।" ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে কিছু পদ্মের ফুলকারি অলংকরণ ছাড়া আর কোন ভাস্কর্য নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'৮" (৩.৩ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ দেবগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। এ মন্দিরটির লাগোয়া ডান পাশে 'ভৈরবেশ্বর' শিবের পশ্চিমমুখী, সপ্তরথ, শিখর-দেউলটির গর্ভগৃহ কিন্তু আটকোণা এবং তার ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮'৬" (২.৫ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ মন্দিরের সাত লাইনের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীভৈরবেশ্বর / দেবতা স্থাপন / পরগণে ভূরুসিষ্ট বরু / ইপুর সাকিনের শ্রীযুত / রামচন্দ্র নন্দী কৃত / শকাব্দা ১৭৬৩ স / ন… …… ৪৩ সাল।" দেবালয়টি, অতএব, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দক্ষিণের 'কাশীশ্বর' শিবের মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে সামান্য পদ্মের অলংকরণ ছাড়া অন্য ভাস্কর্য নেই। প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ দুই পঙ্‌ক্তির উৎসর্গলিপিটি নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীকাসিশ্বর দেবতা। সেবাত শ্রীযুত রামচন্দ্র নন্দী পঃ ভূরসিষ্ঠ সাঃ বরুইপুর / শুভমস্তু সকাব্দা ১৭৬৩ সন ১২৪৮ সাল শ্রীযুত গোপাল মিস্ত্রী সাঃ আটপুর।" একই সালে প্রতিষ্ঠিত এ দুটি আটচালা মন্দির ও সম্ভবত: দেউল-মন্দিরটিরও স্থপতি রামগোপাল মিস্ত্রী ছিলেন হুগলী জেলার আটপুরনিবাসী, যিনি সাধারণের কাছে সংক্ষেপিত গোপাল মিস্ত্রী নামেই হয়ত বেশী পরিচিত ছিলেন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'৮" (৩.৩ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

এ তিনটি মন্দিরের সামান্য উত্তরে, শিবতলায়, পশ্চিমমুখী আর একটি একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়। দৈর্ঘ্যে ১০' ৮" (৩.৩ মি.), প্রস্থে ১০' ৩" (৩.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদও অনুরূপভাবে নির্মিত। অলংকরণহীন এ মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে পথের পলস্তারায় ক্ষোদিত তিন পঙক্তির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীমহাদেব/সন ১২৯৩ সাল/শ্রীবংশিধর দলুই সাং দলুতিচক।" ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরের স্থপতি ছিলেন পাশের গ্রাম দলপতিচকনিবাসী এবং বংশীধর দলুই সম্ভবতঃ এটির প্রতিষ্ঠাতা।

বসন্তপুর : 'গৌরাঙ্গচক' নিবন্ধে মুন্সীরহাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুন্সীরহাট-জয়নগরঘাট পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) পাশে, আমতা থানার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু গ্রাম বসন্তপুর (জে. এল. নং ১৮৯)। এখানকার পুরাকীর্তি বলতে হরি মল্লিকের দীঘি ও রানীর দীঘি নামে দুটি বৃহৎ জলাশয় এবং শেষেরটির পুব পাড়ে 'ত্রিলোকেশ্বর' শিবের দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী একটি ধ্বংসপ্রায় আটচালা মন্দির। স্থানীয় সংবাদে প্রকাশ, বর্ধমানরাজ ত্রিলোকেশ্বরের পত্নী রানী বসন্তকুমারী এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্বামীর নামানুসারে শিবের নাম রাখেন ত্রিলোকেশ্বর এবং তাঁরই খনিত এই দীঘির নাম হয় রানীর দীঘি। সাধারণের বিশ্বাস, রানী বসন্তকুমারীর নামেই গ্রামের নাম বসন্তপুর। মন্দিরটির সামনের দিকের কিছু অংশ ধ্বসে পড়লেও, পোড়ামাটির কিছু জীর্ণ অলংকরণ এখনও দেখা যায়। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন, অধুনালুপ্ত লিপিটিতে প্রতিষ্ঠাকাল নাকি ১৬৭৪ শকাব্দ বলে উল্লিখিত ছিল। একথা সত্য হলে, দেবালয়টি ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' (৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

বাইগাছি : হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে হাওড়া-কোণা-শিয়াখালা পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) পাশে ও পূর্বতন হাওড়া-শিয়াখালা ছোট রেলপথের বলুটি স্টেশনের প্রায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) উত্তরে বাইগাছি গ্রাম (জে. এল নং ১)। বালী থানার অন্তর্গত এ পল্লীতে 'পঞ্চানন্দ' শিবের দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, অলংকরণহীন এক সাধারণ আটচালা মন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাফলকের অভাবে স্থাপত্যের নিরিখে এটিকে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন মনে হয়। কিন্তু ইতোমধ্যেই লোনা ধরে পাতলা ইটগুলি বেশ ক্ষয়ে গেছে। স্থানীয় সংবাদে প্রকাশ,

কলকাতা-হাটখোলার দত্তচৌধুরী পরিবার এটির প্রতিষ্ঠাতা। আগে এ এলাকায় তাঁদের নাকি জমিদারি ছিল। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.)। ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

বাইনান ঃ হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশনে নেমে, বাগনান-বাইনান পিচের সড়কে (নিয়মিত ট্যাক্সি-বাস চলে) ৪ মাইল (৬.৪ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে, বাগনান থানার অন্তর্গত পূর্ব বাইনান (জে. এল. নং ১০) এবং পশ্চিম বাইনান মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ৯) সমৃদ্ধ গ্রাম বাইনান। এখানকার মজুতবেড়ে নামক স্থানে ইটের যে ভগ্নপ্রায় সৌধটি আছে, সেটিকে মন্দির এবং মসজিদজ্ঞানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দাবী করে থাকেন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩.১ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.২ মি.), এ সৌধের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। গঠনশৈলীর নিরিখে, ইমারতটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মধ্যভাগে স্থাপিত বলে মনে হয়।

গ্রামের ষষ্ঠীতলার অদূরে স্থানীয় মুখোপাধ্যায় পরিবারের পুষ্করিণী খননকালে সবুজ পাথরের ('ক্লোরাইট') এক সূর্যমূর্তির নিম্নাংশ ও মধ্যভাগ পাওয়া যায়। শিল্পশৈলীর বিচারে সেটি খ্রীষ্টীয় দশ বা এগারো শতকের পুরাবস্তু বলে অনুমিত হয়। বাইনান বাজারে অবস্থিত শিব-মন্দিরটি প্রাচীন না হলেও বিগ্রহটি বহুদিনের।

গ্রামের জমাদারপাড়ায় এক ঢিপি খননকালে একটি মাটির সরায় রক্ষিত আকবর বাদশাহের আমলের কিছু রুপার মুদ্রা পাওয়া যায়। তার মধ্যে ন'টি মুদ্রা নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে।

বাঁকড়া ঃ হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে হাওড়া-ডোমজুড়-মুন্সীরহাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় ৬ মাইল (৯.৭ কি. মি.) উত্তরে, ডোমজুড় থানার এলাকাধীন বাঁকড়া গ্রাম (জে. এল. নং ৫৫)। পূর্বতন হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে, সমদূরত্বে, বাঁকড়া নামের একটি স্টেশনও ছিল। একদা এখানকার 'শেঠের পুকুর' খননকালে পাথরের একটি সুন্দর (কিন্তু ভগ্ন) নবগ্রহ-ফলক পাওয়া যায়। উচ্চতায় ১৩½″ (৩৪ সে. মি.) ও প্রস্থে ১২″ (৩০.৫ সে. মি.), খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের এ ভাস্কর্যটি বর্তমানে হুগলী জেলার রাজবলহাটের 'অমূল্য প্রত্নশালা'য় রক্ষিত আছে। এই পুরাবস্তুটি এ গ্রামের প্রাচীনত্বের সূচক।

স্থানীয় মিশ্র পরিবারের দুর্গানারায়ণ মিশ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পাশাপাশি দুটি দক্ষিণমুখী, অলংকরণহীন, একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির ও লুপ্তপ্রায় এক বিশালাক্ষীর মন্দির এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। পুব দিকের শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"শ্রী শ্রী৺অভয়েশ্বর সন ১২২৩" এবং পশ্চিম দিকেরটির "শ্রীশ্রী৺জয়েশ্বর সন ১২২৩।" ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয় দুটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ × ১২′ (৪ মি. × ৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.)। উভয়েরই ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। বিশালাক্ষী মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষকবলিত; আগ্রাসী শিকড়জালের ফাঁকে ফাঁকে পুরানো ইটের কিছু গাঁথনি শুধু দেখা যায়। সামনের পুষ্করিণীতে কিশোরীরূপিণী বিশালাক্ষী মায়ের শাঁখাপরা দুটি হাতের জলতলে অন্তর্ধানের সুবিদিত কাহিনীটি এখানেও প্রচলিত।

বাঁকুল: হাওড়া রেল-স্টেশন-মুনশীরহাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পাতিহালের ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বাঁকুল গ্রাম (জে. এল. নং ৭)। আগে হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথের পাতিহাল স্টেশনে নেমেও সেখানে যাওয়া যেত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ-সম্পাদিত 'দি হিস্ট্রি অভ্ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫)' পুস্তকে অতীতকালে আয়ুর্বেদ চর্চার কেন্দ্র হিসাবে এ পল্লীর উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ৪৫৮)। সঙ্গতিসম্পন্ন স্থানীয় কবিরাজ পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পুবপাড়ায় কাছাকাছি দুটি শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, প্রথমটি বর্তমানে জীর্ণ হলেও প্রবেশপথের উপরে লঙ্কাযুদ্ধের 'টেরাকোটা'-ভাস্কর্যটি এখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামনের কার্নিসের নীচে দুই পঙক্তির লিপিফলকটির পাঠ—"শুভমস্তু স / কাব্দা ১৬৮১।" ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১০′ (৩.১ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ২০′ (৬.২ মি.)। গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। এটির সামনেই অপর আটচালা মন্দিরটিতে কোন 'টেরাকোটা'-সজ্জা বা প্রতিষ্ঠালিপি নেই। কিন্তু সেটির আয়তন ও গঠনপ্রণালী অবিকল প্রথমটির মত।

খাঁড়াপাড়ায় কবিরাজ পরিবারের বর্তমান বসতবাটীর কাছে, পাশাপাশি, দক্ষিণমুখী, আর দুটি আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়। উভয়তঃ পোড়ামাটির অলংকরণ এখন জীর্ণ হলেও, দক্ষিণেরটিতে বৃষবাহন শিবের একটি ফলক উচ্চ কারিগরি নৈপুণ্যের নিদর্শন। তার ঠিক উপরে

নিবদ্ধ 'টেরাকোটা'-প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"শুভমস্ত স / কাবদা ১৬৮২।" আয়তন ও গঠনপ্রণালী হুবহু এক হলেও আলোচ্য শিবমন্দিরগুলি প্রথম দুটির থেকে এক বছর পরে (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত।

গ্রামের দীঘির দক্ষিণ-পুব কোণে এবং গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত আর দুটি একদুয়ারী, আটচালা মন্দির তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

স্থানীয় কাজীপাড়ায় পুবমুখী, তিন-গম্বুজ মসজিদটি উল্লেখযোগ্য। দৈর্ঘ্যে ৪৭'৭" (১৪.৫ মি.), প্রস্থে ১৮' (৫.৫ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.), এ মসজিদটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত তিনটি গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। স্থাপত্যবিচারে এটিকে আঠারো শতকের প্রথম ভাগের বলে মনে হয়।

বাছরী : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শশাটিতে নেমে, কাঁচা রাস্তায় ৩ মাইল (৭.৮ কি. মি.) পুবে, শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বাছরী গ্রাম (জে. এল. নং ৪২)। স্থানীয় 'দমদ্‌মা'টি (ঢিপি) এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসাবে গণ্য। জনশ্রুতি, ঢিপিটি অতীতের কোন এক 'ফিঙ্গারাজার' প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। পাশের খাজুরী গ্রামে নাকি ছিল তাঁর কাছারি এবং তোষাখানা। একদা তিনি তাম্রলিপ্তের তাম্রধ্বজ-রাজাকে উপহারস্বরূপ যে মাছ পাঠান, তা তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তাম্রধ্বজ যুদ্ধে 'ফিঙ্গারাজাকে' পরাস্ত করে তাঁর প্রাসাদ বিধ্বস্ত করেন। কিংবদন্তী যাই হোক, গ্রামটির সর্বত্র অসংখ্য খোলামকুচির এবং সামান্য খননের ফলে পুষ্করিণী বা মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির নানাপ্রকার মৃৎপাত্র দেখে স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হয়। অনুসন্ধানের ফলে এখানে যেসব ধূসর বর্ণের নল-লাগানো এবং অন্যবিধ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের মৃৎপাত্রের নিকট সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব পুরাবস্তুর বহু নিদর্শন কলকাতার 'আশুতোষ মিউজিয়ম'এ ও বাগনান-নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে। কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ, বিষ্ণুপট্ট এবং মূর্তিস্থাপনের জন্য পাথরের পাদপীঠ প্রভৃতিও এখানে পাওয়া গিয়েছে। ভাস্কর্যশৈলীর বিচারে সেগুলি খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের বলে মনে হয়। আদিম বঙ্গাক্ষরে পরপর তিন পঙ্‌ক্তিতে 'শ্রীবিশোক' কথাটি উৎকীর্ণ ও শীলমোহরযুক্ত পোড়ামাটির যে ছোট ফলকটি এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা খ্রীষ্টীয় বারো শতকের বলে অনুমিত। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে মাটি খোঁড়ার সময়

পোড়ামাটির বেড়যুক্ত দু একটি পাতকুয়া এবং ১১"×১০"×২½" (২৮×২৫×৬ সে. মি.) মাপের ইটের এক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। এসব পুরাবস্তুর নজিরে মনে হয়, প্রাচীন তাম্রলিপ্তের সমকালীন কোন এক জনপদ হয়ত এখানে গড়ে উঠেছিল। স্থানটি সেজন্য অবশ্যই এক সম্ভাবনাময় প্রত্নক্ষেত্র।

বাঁটুল : 'কানাইপুর' নিবন্ধে বাঁটুলে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাগনান থানার অন্তর্গত এ গ্রামে (জে.এল. নং ৮৩) অনেকগুলি পুরাকীর্তি দেখা যায়। স্থানীয় শাঁখারীপাড়ার দাস পরিবারের গৃহদেবতা দধিবামনজীউর (শালগ্রাম) দক্ষিণমুখী, অলিন্দযুক্ত, নবরত্ন মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। তার সামনের দেওয়ালে, কার্নিসের নীচে এবং দু পাশে, উপর-নীচে, এক সারি করে 'টেরাকোটা'-ফলক ছিল। কিন্তু সেগুলিতে নোনা লাগায়, গৃহস্বামীরা হুগলী জেলার সেনহাট থেকে বৈদ্যনাথ মিস্ত্রীকে আনিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার করান। পোড়ামাটির সাবেক লিপিফলকটি বিনষ্ট হওয়ায় তার পরিবর্তে শ্বেতপাথরের ছয় পঙ্ক্তির যে প্রতিষ্ঠাফলকটি লাগানো হয়েছে তার পাঠ : "বাণ্টুল মন্দির / শ্রীশ্রী৺দধিবামনজী / স্থাপিত ১২০৩ সাল / সেবক ৺নিলমণী দাস / সংস্কার ১৩৩৭ সাল / সেবাইতগণ শ্রীশরৎচন্দ্র দাস শ্রীরামলাল দাস।" ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের পশ্চিম দিকেও একটি দরজা আছে। ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০' (৬.১ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২.২ মি.)। গ্রামের ভুঁইয়াপাড়ায় (আগে এ এলাকা 'জোত-কিশোর' নামে পরিচিত ছিল) পাশাপাশি, পুবমুখী, একদুয়ারী, জোড়া-শিবমন্দিরটি অবস্থিত। দেবালয় দুটি দৈর্ঘ্যে ১২' (৩.৭ মি.), প্রস্থে ১১'৭" (৩.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.)। তাদের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। স্থানীয় সংবাদে প্রকাশ, এ অঞ্চলের জমিদার গোকুলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী আঠারো শতকের শেষ দিকে এগুলির প্রতিষ্ঠা করেন।

এখানে আবিষ্কৃত ও গ্রামের পাণ্ডা পরিবারে রক্ষিত কষ্টিপাথরের একটি বাসুদেবমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উচ্চতায় ২'২" (৬৬ সে. মি.) এবং প্রস্থে ১'১" (৩৩ সে. মি.), এ পুরাবস্তুটি, ভাস্কর্যশৈলীর বিচারে, খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের বলে অনুমিত হয়। বাঁটুল গ্রাম যে বহুদিনের—এই প্রাচীন মূর্তিটি তার প্রমাণ।

বাণীবন : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের উলুবেড়িয়া স্টেশনে নেমে, পাকা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) উত্তরে, উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বাণীবন গ্রাম (জে. এল. নং ৬৩)। হাওড়া-উলুবেড়িয়া বাসে উলুবেড়িয়া হাসপাতালের পুব প্রান্তে নেমে, উত্তরমুখী পাকা রাস্তায় ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) হেঁটে গেলেও সেখানে পৌঁছনো যায়। গ্রামের পীরপুর পল্লীর প্রধান আকর্ষণ পীর আব্বাসউদ্দিন শাহের (সাধারণ্যে 'জঙ্গলবিলাস পীর' নামে পরিচিত) কবরস্থান। বেশ চ্যাপ্টা গড়নের বাংলা-রীতির চারচালা মন্দিরের থেকে এ ইমারতের কোনই পার্থক্য নেই। প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণে হলেও (মসজিদ বা মাজারের প্রবেশপথ পুব দিকে হওয়াই বিধি) পূর্ব দিকে আরও একটি দরজা করে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণের দরজার দু পাশে নকাশি অলংকরণযুক্ত পাথরের যে দ্বারপার্শ্ব ও দ্বারশীর্ষ নিবদ্ধ, ভাস্কর্যশৈলীর নিরিখে তারা খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের কোন হিন্দু মন্দির থেকে সংগৃহীত বলে মনে হয়। দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের উপরে হয়ত কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ ছিল, কিন্তু পুরু চুনের প্রলেপে তা প্রায় অদৃশ্য। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায়, যথাক্রমে, ১৯'২" (৫.৮ মি.), ১৬'১" (৪.৯ মি.) ও আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.)। এ মাজারের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজ দিয়ে তৈরী—যেমন দেখা যায় বহু হিন্দু-মন্দিরের ক্ষেত্রে।

পীর সাহেব সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। বর্ধমানের এক রাজা তাঁকে অবজ্ঞা করলে তিনি তাঁর আজ্ঞাধীন বহু বাঘ নিয়ে নাকি রাজার উপর চড়াও হন। রাজা প্রাণভয়ে যেসব ভূসম্পত্তি পীরোত্তর হিসাবে দান করেন তা থেকেই নাকি মাজারের যাবতীয় খরচ অদ্যাবধি চলে আসছে। এ কিংবদন্তী কিছুমাত্র সত্য হলে, পীর সাহেবের জীবদ্দশার কাল আঠারো শতকের শেষ ভাগের আগে হতে পারে না। কেননা বর্ধমানরাজেরই উদ্ভব হয় সে সময়ে। আর এক লোকশ্রুতি অনুসারে, কবরস্থানের দক্ষিণে যে দীঘি এখনও দেখা যায়, সেখানে তিনি নাকি নিয়মিত বাঘ ও বকরিদের এক-ঘাটে জল খাওয়াতেন।

পৌষসংক্রান্তির দিন পীরের উরস্‌ (বাৎসরিক উৎসব) উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে যা প্রায় ১৫ দিন চলে। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে হাজার হাজার ভক্ত পীরের কাছে শিরনি দেন ও মানত করেন।

বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি জেলার চারচালা মন্দির থেকে আলোচ্য

চারচালাটি অনেক বেশী চ্যাপ্টা গড়নের। স্থাপত্যগত ও অন্য কারণেও সেজন্য প্রশ্ন ওঠে, ইমারতটির নির্মাতারা হিন্দু না মুসলমান? স্থানীয় মুসলমানদের কিংবদন্তীআশ্রিত দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লা মাত্র একরাত্রির মধ্যে (খোদার কজলে যে-রাত্রি নাকি সাত দিন স্থায়ী হয়েছিল) এটি নির্মাণ করেন। এ বিশ্বাস অনুসারে, নির্মাতা যদি মুসলমান (বা খোদা) হন, তা হলে এ এক আশ্চর্য ইমারত, কেননা, হিন্দু-স্থাপত্যরীতিতে গড়া কোন মোসলেম ইমারত পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পীরের বাৎসরিক উৎসবের দিনটি হিন্দু-বর্ষপঞ্জী অনুসারে পৌষসংক্রান্তির দিনে (যা 'মকরসংক্রান্তি' নামে হিন্দুদের কাছে অতি পুণ্যদিন) নির্দিষ্ট হওয়াটাও লক্ষণীয়। মাজারের প্রধান প্রবেশপথ পুবমুখী না হয়ে যে দক্ষিণমুখী সেটাও মোসলেম ধর্মীয় সৌধের ক্ষেত্রে এক গুরুতর ব্যতিক্রম। হিন্দু-দেবালয়ের মালমসলা দিয়ে গড়া (অন্ততঃ আংশিক-ভাবে) মুসলিম ইমারতের বহু নজির ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বর্তমান ক্ষেত্রে পূর্বতন এক হিন্দু-মন্দিরের ক্ষতি না করে হয়ত তার সবটাই পীরের মাজার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অনুমান যে অভ্রান্ত সেকথা বলবার জন্য প্রতিষ্ঠাফলকের মত অকাট্য কোন প্রমাণ অন্ততঃ এখন আর নেই। কিন্তু এ ধারণা সত্য হলে, এটিকে এক অতুলনীয় ইমারত বলা চলে, যেহেতু মুসলমানদের দ্বারা প্রাক্তন হিন্দু-মন্দিরের এহেন সার্বিক ব্যবহারের অন্য দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হয় না।

বাণেশ্বরপুর: হাওড়া-আমতা পিচের সড়কে (মুনশীরহাট হয়ে নিয়মিত বাস চলে) রামচন্দ্রপুর-আমুলিয়ায় নেমে, সামান্য পুবে অবস্থিত আমতা থানার অন্তর্গত বাণেশ্বরপুর গ্রাম (জে. এল. নং ১৯৪)। স্থানীয় 'বাণেশ্বর' শিবের নামেই গ্রামের নাম। শিবতলায় তাঁর পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। অলংকরণ-বিহীন ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২'৬" (৩.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। মন্দিরটিতে লিপিফলক না থাকলেও স্থাপত্যশৈলীর বিচারে এটি আঠারো শতকের শেষ ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

বাদেবালিয়া: 'পাতিহাল' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাতিহালের দক্ষিণ-পশ্চিমে, অদূরে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বাদেবালিয়া গ্রাম (জে. এল. নং ৪৭)। এ পল্লীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'দেউলপোতা' নামে একটি উঁচু ঢিপি এবং কাছাকাছি 'দেউলপোতার দহ' নামে একটি বৃহৎ জলাশয় এখানকার

উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। প্রায় ২০' (৬.১ মি.) উচ্চতার ঢিপিটি সম্পর্কে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, সেটির মধ্যে প্রাচীন কোন দেব-দেউলের ধ্বংসাবশেষ নিহিত। সম্প্রতিকালে এ অঞ্চলে প্রাপ্ত নানান আকারের ইট নিজ-বালিয়ার 'সবুজ গ্রন্থাগারে' রক্ষিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে 'দেউল' শব্দযুক্ত স্থান-নামের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান বা লুপ্ত মন্দিরাদির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানেও হয়ত তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু ঢিপিটিতে উৎখনন চালানোর আগে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

বাঁধেরবাজার : 'উত্তর ঝাঁপড়দহ' নিবন্ধে ডোমজুড়ে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে হাঁটাপথে ৪ মাইল (৬.৪ কি. মি.) দক্ষিণে, খসমহরা মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ১৩), ডোমজুড় থানার এলাকাধীন বাঁধেরবাজার গ্রাম। এখানকার পুরাকীর্তি—খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের দুটি মন্দির। প্রথমটি ব্রজনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্রশেখর-ব্রজেশ্বর' শিবের পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দির। প্রতিষ্ঠাতার নামে দেবতার নামকরণের আরও দৃষ্টান্ত আছে পশ্চিমবঙ্গে। এ দেবালয়ে শ্বেতপাথরের চার পঙ্‌ক্তির লিপির পাঠ—"শ্রীশ্রী৺ চন্দ্রশেখর / ব্রজেশ্বর জিউর মন্দির / প্রতিষ্ঠাতা ব্রজনাথ ঘোষ / সন ১২৮২ সাল।" ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পঙ্খের কিছু জ্যামিতিক ও নকাশি অলংকরণ দেখা যায়। প্রবেশদ্বারের দু পাশে ২½' (৭৬ সে. মি.) উচ্চতায় যে দুটি দ্বারপাল আছে তাদের ইউরোপীয় পোষাক অভিনব।

এ দেবালয়ের সামান্য পুবে, দক্ষিণমুখী একটি একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরে দেবী সিংহবাহিনী অধিষ্ঠিতা। প্রবেশদ্বারে পঙ্খের কাজ-করা ২½' (৭৬ সে. মি.) উচ্চতার দুটি নারীমূর্তি দ্বারপালিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন হলেও এ দেবালয় পূর্বোক্ত মন্দিরের সমকালীন হওয়াই সম্ভব।

বামুনপাড়া : মুন্সীরহাটের সংলগ্ন গ্রাম সেকরাহাটি। কাঁচা রাস্তায় তার ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বামুনপাড়া গ্রাম (জে. এল. নং ১৬)। গ্রামের পরামাণিক পাড়ায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি 'টেরাকোটা'-অলংকৃত, একদুয়ারী, পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। বটবৃক্ষকবলিত এ-মন্দিরটি বর্তমানে এতই জীর্ণ যে, যেকোন সময়ে ধূলিসাৎ হতে পারে। প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির সজ্জায় প্রধানতঃ

লম্বাবুদ্ধ ও পদ্ম উৎকীর্ণ। কিন্তু সেগুলি বেশ ক্ষয়িত। সামনের কার্নিসের নীচে পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠাফলকটির পাঠ—"শুভমস্তু সকাবদা ১৬৯৯।" দৈর্ঘ্যে ১৫'৮" (৪.৮ মি.), প্রস্থে ১২'২" (৩.৮ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

বালী : হাওড়া স্টেশন থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে (নিয়মিত বহু বাস চলে) ৬ মাইল (৯.৬ কি. মি.) উত্তরে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বালী শহরে (জে. এল. নং ১৪) যাওয়া যায়। বালী রেল-স্টেশনে নেমে সাইকেল-রিক্শয়ও সেখানে পৌঁছনো সম্ভব। খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকে রচিত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ বালী গ্রামের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া রেণেলের 'মেময়র্স্ অভ্ এ ম্যাপ অভ্ হিন্দুস্তান' গ্রন্থেও (১৭৮৩) এ স্থানটি চিহ্নিত। স্থানীয় কল্যাণেশ্বরতলায় স্বয়ম্ভু 'কল্যাণেশ্বর' শিবের মন্দিরটি এখানকার শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি। সামনে ত্রিখিলান অলিন্দযুক্ত, পশ্চিমমুখী, এ আটচালা মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা নাকি কলকাতার মেছুয়াবাজারের দয়ারাম বসু অথবা, মতান্তরে, শেওড়াফুলির তৎকালীন রাজা। অলংকরণবিহীন এ দেবালয়ের দালানের ছাদ টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসমেত চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ২৪' ৪" (৭.৪ মি.), প্রস্থে ২২' ৫" (৬.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৫' (১৩.৭ মি.), এ উৎসর্গলিপিহীন, বৃহদায়তন দেবালয়টি, স্থাপত্য-বিচারে, আঠারো শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। 'কল্যাণেশ্বর' এ অঞ্চলের বিখ্যাত শিব। চৈত্রসংক্রান্তিতে তাঁর গাজন উপলক্ষে এখানে যে মেলা বসে তা প্রায় এক মাস চলে।

এ দেবালয়ের নাটমন্দিরের পশ্চিম পাশে এক ছোট কুঠরিতে রক্ষিত কষ্টিপাথরের দুটি বিষ্ণুমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় রামনবমীতলায় এক পুষ্করিণীতে সেগুলি নাকি পাওয়া যায়। একটি মূর্তি উচ্চতায় ৪' ৯" (১.৪ মি.) ও প্রস্থে ২' ৬" (৭৬ সে. মি.) এবং অন্যটি উচ্চতায় ২' ৬" (৭৬ সে. মি.) ও প্রস্থে ১' ২" (৩৬ সে. মি.)। প্রথমোক্ত মূর্তিটির মস্তক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, সিমেন্ট দিয়ে মেরামত করে কালো রং লাগান হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টি অবিকৃত। ভাস্কর্যশৈলীর বিচারে, এই পুরাবস্তুগুলি খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের বলে মনে হয়।

ভিংসাইপাড়ায় চক্রবর্তী পরিবারের পূবমুখী, একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। এটির সম্মুখভাগে চুনসুরকির কিছু

নকাশি অলংকরণ এবং পাঁচ পঙ্‌ক্তির লিপিটি প্রায় বিনষ্ট। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। স্থাপত্যবিচারে, মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

বিবেকানন্দ সেতুর নীচে, উত্তর গায়ে, পুরানো বাঁধাঘাটে একদা যে মন্দিরগুলি ছিল, তাদের স্থানে এখন গোলাকার দুটি দোতলা সৌধ দেখা যায়। দক্ষিণ দিকেরটি বটবৃক্ষকবলিত হলেও তার প্রবেশপথের উপরে কালো পাথরে ক্ষোদিত তিন পঙ্‌ক্তির লিপিটির পাঠ—"শ্রীদুর্গাচরণে আষ / শ্রীকৃষ্ণচরণ দে দাষ / সন ১২০৯ সাল।" জনশ্রুতি, কৃষ্ণচরণ দে শোভাবাজার রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। উত্তরের সৌধটি সংস্কার করে এখন এক কালীমন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। পুরাতন 'হিবার্স জর্নালে'ও সৌধগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ সেতুর দক্ষিণ দিকের বাঁধাঘাটের দু পাশে, উত্তর ও দক্ষিণমুখী দুটি আটচালা শিবমন্দিরও এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়গুলিতে একদা চুনবালির অলংকরণ ছিল। উত্তর ও দক্ষিণমুখী মন্দির হলেও দুটি মন্দিরেই পুব দিকে (ভাগীরথীমুখী) আর একটি করে দরজা আছে। উভয়েরই বিগ্রহ শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ। উত্তরমুখী মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৪′১″ (৪.৩ মি.), প্রস্থে ১২′৯″ (৩.৯ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.)। দক্ষিণমুখীটি দৈর্ঘ্যে ১৪′৬″ (৪.৪ মি.), প্রস্থে ১৩′ (৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.)। দুটি মন্দিরেরই গর্ভগৃহের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

বালীতে একদা যে আরও মন্দির ছিল সে সম্পর্কে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বালীর ইতিহাসের ভূমিকা' পুস্তিকায় দেখা যায়—"এতদ্ব্যতীত ১২৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত জোড়া মন্দির, সেনপাড়ায় কোঙারদের মন্দির, ...ছ-আনী রাজার মন্দির, কাকেশ্বরতলা ও ডিংসাইপাড়ার শিবমন্দির, সান্যালদের রাসমঞ্চ প্রভৃতি বহু দেবালয়ই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।" (পৃ: ১১)। উল্লিখিত দেবালয়গুলির মধ্যে জোড়া শিবমন্দির ও ডিংসাইপাড়ার মন্দির সম্পর্কে সম্প্রতিকালের বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে এখানকার ঘোষপাড়ার

ষষ্ঠীতলায় এক পুরানো বটগাছ ঝড়ে উপড়ে গেলে, নীচের মাটির ভিতর থেকে একটি 'টেরাকোটা'-ফলক আবিষ্কৃত হয় যার এক পিঠে "ব্রজনাথ/ বিমলা / সতীদাহ / ১২০৬" এবং অন্য পিঠে দুটি হাতের ছাপের নকশার সঙ্গে "শ্রী ম শু ঘো" ও "সন ১২৮৫" লিপিগুলি উৎকীর্ণ দেখা যায়। একদা সহমরণ অনুষ্ঠানের স্থানে এহেন স্মারকফলক প্রতিষ্ঠা করার রীতি ছিল। এ ফলকটি বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে।

বালীটিকুরী : হাওড়া-ডোমজুড় পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) পাশে, জগাছা থানার অন্তর্গত বালীটিকুরী গ্রাম (জে. এল. নং ১)। স্থানীয় বারোয়ারিতলায় দক্ষিণমুখী একটি আটচালা শিবমন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' (৩.৪ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৫' (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা গঠিত। স্থাপত্যরীতির নিরিখে, এটি উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

এ মন্দিরের ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) পুবে, পিচের সড়কের উত্তর পাশে, অতি আধুনিক এক চারচালা মন্দিরে খ্রীষ্টীয় বারো শতকের (আনুমানিক) যে বিষ্ণুমূর্তিটি রক্ষিত আছে তার উচ্চতা ২'৪" (৭১ সে.মি.) ও প্রস্থ ১'২" (৩৫·৫ সে.মি.)। সাবেক সরস্বতীতীরবর্তী কোন প্রাচীন মন্দিরে এ বিগ্রহটি হয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিনোদবাটি : 'উদয়নারায়ণপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদয়নারায়ণপুর থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) উত্তরে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত কুর্চি-বিনোদবাটি মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ১৫) বিনোদবাটি গ্রাম। গ্রামের বিশালাক্ষীতলায় দক্ষিণমুখী এক জোড়া একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরের মধ্যে পশ্চিম দিকেরটির প্রবেশপথের বাঁ দিকের দেওয়ালে পঙ্খের পলস্তারার উপর আট পঙ্‌ক্তির সংস্কারলিপিটির পাঠ— "শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী মাতা / মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ৺পঞ্চানন / বেরা সাং বিনোদবাটী / সন ১২৮৬ সাল। গ্রামবাসীগণ কর্তৃক / সন ১৩৬২ সালে সংস্কার / সাধিত হইল॥ / সংস্কারক যতীন্দ্র মিস্ত্রী।" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়টি দৈর্ঘ্যে ৯' ১০" (২.৯ মি.), প্রস্থে ৯' ৬" (২.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫' (৪.৬ মি.)। মন্দিরটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দেবী বিশালাক্ষীর মূর্তিটি মাটির হলেও বেশ

চিত্তাকর্ষক। পাশেই, পরবর্তীকালে নির্মিত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৩″ (৩.২ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.), আটচালা শিবমন্দিরটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

বেতড় : হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে হাওড়া-বেতাইতলা-বি. ই. কলেজ পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সেখানে পৌঁছনো যায়। শিবপুর থানার অন্তর্গত বর্তমানের বেতড় এক প্রাচীন স্থান। লক্ষণ-সেনের গোবিন্দপুর তাম্রপট্টে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরক-এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে স্বর্গত কালিদাস দত্তের মন্তব্য— "...গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষণসেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দারা তিনি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরকের অধীন বিড্ডরশাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা দেওয়া আছে -উত্তর-ধর্মনগর সীমা, পূর্ব-জাহ্নবী অদ্ধসীমা, দক্ষিণ-লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা, পশ্চিম-ডালিম্বক্ষেত্র সীমা। এই চতুঃসীমা হইতে বুঝা যায় যে, বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরক নামক বিভাগ পূর্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড-চতুরক বর্তমান হাওড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।"

খ্রীষ্টীয় পনরো শতকের শেষ ভাগে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসামঙ্গলে'ও বেতড় এবং স্থানীয় লৌকিক দেবী বেতাইচণ্ডী সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেজন্য পরবর্তীকালে এ অঞ্চল বেতাইতলা নামে পরিচিত হয়। সিজার ফ্রেডারিক নামে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে বেতড় পরিদর্শন করে লিখেছিলেন —শীতের সময় পর্তুগীজদের বাণিজ্যের দৌলতে এখানে এক বিরাট বাজার বসত। শীতের শেষে অস্থায়ী চালাঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে তারা চলে যেত এক বছরের মত। বেতড়ের সমকালীন গুরুত্বের প্রমাণ, ডি-ব্যারোজ (খ্রীঃ ১৫৫২-১৬১৩), ব্লায়েভ (খ্রীঃ ১৬৪৫-৫০) এবং রেণেলের (খ্রীঃ ১৭৭৯-৮১) ম্যাপে এই স্থানের উল্লেখ। কিন্তু বর্তমানের শহুরে পরিবেশে, সিন্দুরলিপ্ত বেতাইচণ্ডীর এক সাধারণ মন্দিরে অবস্থান ছাড়া বেতড়ের পূর্বগৌরবের আর সব স্মৃতিচিহ্নই বিলুপ্ত হয়েছে।

বেলুড় মঠ : এক শ বছরের বেশী প্রাচীন নয় বলে, বেলুড় মঠের চত্বরে অবস্থিত মন্দিরাদি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সংজ্ঞার্থ অনুসারে

পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরটি আয়তনে এতই বিশাল ও স্থাপত্যশৈলীতে এতই অভিনব যে, অনুরূপ কোন উপাসনালয় আজকের পশ্চিমবঙ্গে তো নেই-ই, অতীতেও ছিল না। অন্যান্য স্মৃতিসৌধগুলিও বাঙালীর আধুনিক ধর্মচিন্তার ইতিহাস-বাহীরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পৃথক নিবন্ধ-রচনার সেটাই পর্যাপ্ত হেতু। একই কারণে, বালী পৌর এলাকার অন্তর্গত হলেও, বেলুড় মঠকে সে-নিবন্ধের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে বালীখালগামী যেকোন বাসে অথবা পূর্ব রেলপথের বেলুড় স্টেশনে নেমে, সাইকেল-রিক্সযোগে সহজেই সেখানে পৌঁছনো যায়। মূল মন্দিরটির আদি পরিকল্পনা স্বামী বিবেকানন্দের। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থের নবম খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায় তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে—"এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি,তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা ক'রব। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র ব'সে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় ক'রে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক 'ওঁকার' বলে ধারণা হয়। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে, স্বামীজী যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত পরিক্রমারত, তখন তাঁর অন্যতম ভ্রমণসঙ্গী ও গুরু-ভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (পূর্বজীবনে হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও কর্মসূত্রে ইঞ্জিনীয়ার) প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্থাপত্যরীতিগুলিতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, স্বামীজী-পরিকল্পিত প্রস্তাবিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরটি যেন সবভারতীয় স্থাপত্যভাস্কর্যকলার প্রতিরূপস্বরূপ নিদর্শন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, বেলুড় মঠে স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত মন্দিরটি সম্বন্ধে শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পরে, এক ইউরোপীয় পদস্থ সরকারী স্থপতির সহযোগিতায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যে নকশাটি প্রস্তুত করেন, তা স্বামী বিবেকানন্দের অনুমোদন লাভ করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ স্বামী শিবানন্দ (বেলুড় মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ) শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শ্রীমতী হেলেন এফ. রুবেলের (এদেশে 'ভক্তি' নামে পরিচিতা) প্রভূত দানে এবং পরবর্তীকালে জনসাধারণের সহযোগিতায় লব্ধ অর্থে মন্দির নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত হয় এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই, স্নানযাত্রার পুণ্যদিনে, আগের ভিত্তিস্থান থেকে, প্রয়োজন-বোধে সামান্য দূরে, দ্বিতীয়বার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। প্রধানতঃ অর্থাভাবে, শেষ অবধি যে সুস্বীকৃত নকশাটি মার্টিন বার্ণ কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শে গৃহীত হয়, সেটি স্বামীজীর সাবেক পরিকল্পনা-অনুসারী না হলেও, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ অনুযায়ী ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপত্যরীতির একীভূত নিদর্শন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরটি উৎসর্গ করেন।

বাইরের মাপ অনুসারে, দক্ষিণমুখী এ উপাসনালয়ের মোট দৈর্ঘ্য ২৩৫′ (৭০.১ মি.), প্রস্থ ১৪০′ (৪২.৬ মি.) ও প্রধান শিখরশীর্ষ অবধি উচ্চতা ১০৮′ (৩২.৯ মি.)। প্রবেশপথের পরেই নাটমন্দিরের ভিতরের আয়তন ১৫২′ (৪৬.৩ মি.) লম্বা, ৭২′ (২২ মি.) চওড়া এবং ৪৮′ (১৪.৬ মি.) উঁচু। প্রবেশপথের ঠিক উপরের চৈত্য-গবাক্ষটি মহারাষ্ট্রের কার্লী গুহার অনুরূপ অলংকরণ দ্বারা প্রভাবিত। ছাদের বহিরাকৃতি নির্মাণে বাংলার চালা-স্থাপত্য প্রাধান্য পেলেও, আমলকশীর্ষ সর্বোচ্চ চূড়াটির প্রেরণা ওড়িশা-শৈলীলব্ধ। অনেকে মনে করেন, স্তম্ভপ্রান্ত উপাসনাকক্ষটির সঙ্গে গীর্জার ভজনালয়ের সাদৃশ্য আছে। স্থাপত্যের আঙ্গিকে বহুধর্মসমন্বয়ের এহেন সকল প্রয়াস পশ্চিমবাংলায় আর নেই। এ মন্দিরের অনুকরণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নির্মিত আরও অনেক ছোট ছোট মন্দিরের কল্যাণে একই সৌন্দর্যসৃষ্টি ও ভাবাদর্শের প্রেরণা বহুস্থানে প্রসারিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহর হিসাবে ব্যবহৃত প্রতীকচিহ্নের যে বহুগুণবর্ধিত ভাস্কর্যটি বেলুড়ের মূল মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ আছে, তার মর্মার্থ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের আর একটি উদ্ধৃতি (পৃঃ ১৯০) থেকে পরিস্ফুট হবে। "স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিতকমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া……বুঝাইয়া দিলেন : চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পবেষ্টনীটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়--চিত্রের ইহাই অর্থ।"

বেলুড় মঠপ্রাঙ্গণে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসৌধগুলি ছাড়াও এখানে সর্বপ্রথম নির্মিত দুটি বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসংগ্রহকক্ষ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম পূজাকক্ষটিও, বৃহত্তর অর্থে, মন্দিরের পর্যায়ভুক্ত।

বৈঁচি : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ধর্মতলায় নেমে, পুবমুখী শশাটি-খাড়ুবেড়ে কাঁচা রাস্তায় ৩ মাইল (৪.৮ কি. মি.) দূরে, শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বৈঁচি গ্রাম (জে. এল. নং ৭৪)। স্থানীয় খালের ধারে, দক্ষিণরায়তলায়, দক্ষিণরায় নামে পূজিত কষ্টিপাথরের এক অদ্ভুত গড়নের মূর্তি এখানকার উল্লেখ্য পুরাবস্তু। উচ্চতায় ১'৫" (৪৩ সে. মি.) ও প্রস্থে ১১" (২৮ সে. মি.) মূর্তিটির পিছনে কোন পটভূমি নেই। আকৃতি বিকটাকার যক্ষমূর্তির মত। তার এক হাতে কৃপাণজাতীয় কোন আয়ুধ; অন্য হাতেরটি অস্পষ্ট। আনুমানিক পাল-যুগের এ ভাস্কর্যটি হয়ত কোন প্রাচীন মন্দিরের অলংকরণ। কিন্তু সে মন্দিরের অবস্থানস্থল সম্বন্ধে এখন কিছু জানা যায় না।

ভাটোরা—'কুলিয়া' নিবন্ধে ভাটোরা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমতা থানার এলাকাধীন দক্ষিণ ভাটোরা মৌজাভুক্ত (জে. এল নং ৭৯) ভাটোরাবাজারে স্থানীয় পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জলেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি এখানকার উল্লেখ্য পুরাকীর্তি।৮ সেটির দক্ষিণ দিকেও একটি প্রবেশদ্বার আছে। প্রধান প্রবেশপথের উপরে, কার্নিসের নীচে এবং দু পাশের কুলুঙ্গিতে, উল্লম্বভাবে এক সারি করে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পোড়ামাটির ফলক দেখা

যায়। কারিগরি নৈপুণ্য খুব উচ্চ মানের না হলেও সেগুলি এখনও বেশ অক্ষত আছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪.৩ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.), প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। স্থাপত্যের নিরিখে এবং স্থানীয় সংবাদের ভিত্তিতে, মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

ভাণ্ডারগাছা : হাওড়া-রানীহাটি-আমতা পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) সঙ্গে উলুবেড়িয়া-আমতা সড়কের সংযোগস্থলে আমতা থানার অন্তর্গত ভাণ্ডারগাছা গ্রাম (জে. এল. নং ২১৫)। স্থানীয় কাউরপাড়ায় কাউর পরিবারের গৃহদেবী গজলক্ষ্মীর পশ্চিমমুখী, অলিন্দ-যুক্ত আটচালা মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। বিগ্রহ গজবাহিতা দুর্গামূর্তি। ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালে পোড়ামাটির সজ্জায় লঙ্কাযুদ্ধ, কালী ও অন্যান্য দেবদেবীমূর্তি, মিথুন-ভাস্কর্য, শিঙাবাদক এবং নৃত্যরতা নর্তকীদের মূর্তি দেখা যায়। ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক সারিতে এবং থামের নীচে কেবল নকাশি 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ। সামনের কার্নিসের নীচে এক পঙ্ক্তির যে দীর্ঘ উৎসর্গলিপি আছে তার পাঠ—"শ্রীশ্রীরাম : গোপনন্দন দসরত ধোসস্ত দিয়ত্তেমস্তু শকা শুভমস্তু সকাব্দা ১৭০৭ শ্রীশ্রীলক্ষিনারায়ণের চরণার্চ্চনাস তস্য পুত্র শ্রীকামদেব ঘোষ।" ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়ের অলিন্দের ছাদ টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৪′ ৬″ (৪.৪ মি.), প্রস্থে ১২′ ৩″ (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.)।

এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে, কাউরপাড়ায় এক পুষ্করিণীর পাড়ে, কাউর পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শতাধিক বৎসরের প্রাচীন আরও একটি পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির আছে। অলংকরণবিহীন এ দেবগৃহের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসমেত চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা গঠিত। দেবালয়টির দৈর্ঘ্য ১৪′ (৪.৩ মি.), প্রস্থ ১১′ ৮″ (৩.৬ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ৩৩′ (১০.১ মি.)।

এ মন্দিরের প্রায় লাগোয়া দক্ষিণে, স্থানীয় বাকুলি পরিবারের গৃহাঙ্গনে, প্রতিষ্ঠালিপিহীন, পূবমুখী, একদুয়ারী এক আটচালা শিবমন্দিরের গড়ন ও জীর্ণ দশা থেকেই বোঝা যায় সেটি শতাধিক বৎসরের

প্রাচীন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯' ৬" (২.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

ভোটবাগান : হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে বালীখালগামী পিচের সড়কে (নিয়মিত বহু বাস চলে) ঘুসুড়িতে নেমে, ৫ নং গোসাঁইঘাট রোডে অবস্থিত ভোটবাগান মঠে পৌঁছনো যায়। স্থানীয় লোকের কাছে এটি মহাকালমঠ বা শঙ্করমঠ নামে পরিচিত। তিব্বতী ভুটিয়ারা চলতি কথায় 'ভোট' নামে পরিচিত বলে, তাঁদের জন্য স্থাপিত এ মঠের নাম হয়েছে ভোটবাগান। মঠের প্রতিষ্ঠাতা পূরণ গিরি সম্পর্কে অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর পদবী 'পুরী' বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু আসলে পদবীটি দশনামী সম্প্রদায়ের 'গিরি' ; তাঁর কথায়--"আমাদের এই ঊর্ধ্ববাহু ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া দু একবার রাজকার্যও করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে সময়ে ভোট দেশের (তিব্বতের) রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময় তথাকার রাজপুরুষেরা তাঁহার দ্বারা গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের সমীপে রাজকার্য সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি সেই সমস্ত লইয়া বারওয়েল এবং এলিয়ট সাহেবের সমক্ষে (হেস্টিংসকে) অর্পণ করিয়াছিলেন। আর একবার তাঁহাকে কাশী নগরীতে রাজা চেত্ সিং ও তাঁহার রেসিডেন্ট গ্রেহামের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভুটান ও কোচবিহারের মধ্যে সংঘর্ষে কোচবিহার-রাজ রুদ্রনারায়ণ বন্দী হন ও সিংহাসন লাভ করেন তাঁর ভাই রাজেন্দ্র-নারায়ণ। বন্দী অবস্থায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে, তাঁর পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ কিছুদিনের জন্য রাজা হন। কিন্তু অল্পকাল পরে ভুটান গোটা কোচবিহার রাজ্যটি দখল করে নেয়। ধরেন্দ্রনারায়ণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সাহায্য চাইলে, ইংরেজরা ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কোচ-বিহার অধিকার করে। ভুটানরাজ তখন তিব্বতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিব্বতের তাশী লামা এ বিষয়ে একটা মিটমাটের উদ্দেশ্যে হেস্টিংসের কাছে যে দু জন প্রতিনিধি পাঠান তাঁদের একজন ছিলেন তিব্বতদেশীয় পাইমা এবং অন্যজন পূরণ গিরি। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস ভুটানের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং সে সুযোগে তিব্বত-ভুটানের বিশাল অনুন্নত এলাকায় ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে তাশী লামার কাছে যে প্রতিনিধি দল পাঠান, তাতে ছিলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের জর্জ বোগলে ও পূরণ গিরি। সকল বোগলে

মিশনের ভারতে ফেরার সময় তাশী লামা হেস্টিংসের কাছে এক অনুরোধ জানান যে, তিব্বতী তীর্থযাত্রী, বণিক্ এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অবস্থানের জন্যে তিনি যেন কলকাতার কাছাকাছি ভাগীরথীতীরে এক খণ্ড জমির বন্দোবস্ত করে দেন যেখানে পূরণ গিরির তত্বাবধানে একটি বৌদ্ধ-মঠ ও আশ্রম নির্মিত হতে পারে। হেস্টিংস এ আবেদন মঞ্জুর করে ঘুসুড়িতে পাশাপাশি ১০০ বিঘা ৮ কাঠার একটি এবং ৫০ বিঘার আর একটি জমির বন্দোবস্ত করে দেন। অতঃপর সেখানে পূরণ গিরির প্রযত্নে এবং পাঞ্চেন লামার অর্থসাহায্যে একটি মঠ, তিব্বতী লামাদের অবস্থানের জন্য একটি আশ্রম এবং তিব্বতী ব্যবসায়ীদের জন্য এক সরাইখানা গড়ে ওঠে। মঠে প্রতিষ্ঠিত হয় তিব্বত থেকে আনীত আর্যতারা, মহাকালভৈরব, বজ্রভ্রুকুটি, পদ্মপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি।

বহু সংস্কারের ফলে, এ মঠ বর্তমানে একটি দোতলা দালান মাত্র—তিব্বতী গুম্ফার সঙ্গে তার কোনই সাদৃশ্য নেই। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে, ভিতরের প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তের দালান-রীতির মন্দিরে পূরণ গিরির সংগৃহীত এই মূর্তিগুলি আজও উপাসিত। অতি বিশদ ও সুচারু কারুকার্যে মণ্ডিত পিতলের এক বৃহৎ সিংহাসনের উপর বিগ্রহ-গুলি স্থাপিত। তার বাঁ পাশে ২′ (৬১ সে. মি.) উচ্চতার যে তারামূর্তিটি দেখা যায়, তার কারিগরি নৈপুণ্য খুবই উচ্চশ্রেণীর।

মঠের চত্বরে পূর্বতন মহন্তদের ছোটবড় সমাধিমন্দির সংখ্যায় দশটি। সবচেয়ে যেটি বড়, তার নীচে যে পূরণ গিরি সমাহিত আছেন, সেকথা এক পিতলের প্রতিষ্ঠাফলকে বর্ণিত। প্রসঙ্গতঃ, পিতলের পাতে উৎকীর্ণ মন্দিরলিপি পশ্চিমবঙ্গে একান্তই বিরল। এ লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৭১৭ শকাব্দে (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত।

সাবেক ১৫০ বিঘা জমির ৫ বিঘাও এখন এ প্রতিষ্ঠানের দখলে আছে কিনা সন্দেহ। এ অঞ্চলে দ্রুত শিল্পপ্রসারের ফলে মঠের বহু জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। সম্পত্তিঘটিত মামলায় অছিও নিযুক্ত হয়েছেন কয়েকবার। তবু ভারত-তিব্বত সংস্কৃতির এককালীন মিলনকেন্দ্র হিসাবে অতীতগৌরব এ মঠের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

মধ্য মাজু : 'দক্ষিণ মাজু' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ মাজুর সংলগ্ন উত্তরে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম মধ্য মাজু (জে. এল. নং ৩৩)। গ্রামের বসুপাড়ায় পাশাপাশি তিনটি মন্দিরের মধ্যে নীলকণ্ঠ মহাদেবের দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আট-

চালা মন্দিরটি দ্রষ্টব্য। তার সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ শ্বেতপাথরের লিপির পাঠ—"এই দেবমন্দির স্বর্গীয় নিমাইচরণ দত্ত মহাশয় / কর্তৃক স্থাপিত / এবং ২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১২৫৪ বঃ শঃ / ইং ৮ই ডিসেম্বর ১৮৪৭ সন তদীয় দানপত্র দ্বারা উৎসর্গীকৃত / ২০শে আশ্বিন ১৩৬৯।" দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৯′ ৬″ (২.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

মনসুকা: 'কানুপাট' নিবন্ধে জয়নগরঘাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দামোদর নদ পার হয়ে, বাঁধ-রাস্তায় প্রায় ১½ মাইল (২.৪ কি.মি.) উত্তর-পশ্চিমে, উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত মনসুকা গ্রাম (জে. এল. নং ৪৫)। স্থানীয় চোঙদারপাড়ায় চোঙদার পরিবারের গৃহদেবতা কূর্মমূর্তি ধর্মরাজের মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী এ আটচালা মন্দিরে কোন অলংকরণ বা প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে পারিবারিক শ্রুতি অনুসারে, এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১৩′ ৭″ (৪.২ মি.), প্রস্থে ১২′ ৭″ (৩.৯ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২৫′ (৭.৬ মি.), এ মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা গঠিত।

মহিষামুড়ি: 'অমরাগড়ি' নিবন্ধে আমতা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমতা-বাগনান পিচের সড়কে (নিয়মিত ট্যাক্সি চলে) দামোদরতীরবর্তী মহিষামুড়ির ঘাট পেরিয়ে, কাঁচা রাস্তায় ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) পশ্চিমে, আমতা থানার অন্তর্গত মহিষামুড়ি গ্রাম (জে. এল. নং ১৩২)। এখানকার ঘোষ পরিবারের গৃহদেবতা ভুবনেশ্বরী দেবীর অলিন্দযুক্ত, দক্ষিণমুখী, আটচালা মন্দিরটি শুধু স্থানীয়ভাবেই নয়, গোটা হাওড়া জেলার মধ্যে এক উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। বিগ্রহ সিংহবাহিনী দুর্গারূপিণী ভুবনেশ্বরী। তাঁর গাজন হয় চৈত্র মাসে এবং চড়ক উপলক্ষে এক মেলাও বসে। ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে 'টেরাকোটা'র লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য; ভিত্তিবেদীর উপরে অনুভূমিক সারিতে শিকারযাত্রা, শোভাযাত্রা, ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা প্রভৃতি সামাজিক দৃশ্য এবং তার উপরে, বাঁ দিকে, রামায়ণকাহিনীর বিবিধ রূপায়ণ ও ডান দিকে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ফলক। এ ছাড়া খাড়াভাবে দু পাশে এক সারি এবং বাঁকানো কার্নিসের অনুভূমিকভাবে দু সারি দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবীর কুলঙ্গিস্থিত মূর্তিফলক দেখা যায়। মিথুন-

ফলকও কিছু আছে। দালানের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা এবং আয়তাকার গর্ভগৃহের ছাদ পুব-পশ্চিমে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ২১' (৬.৪ মি.), প্রস্থে ১৮' ৪" (৫.৬ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০.৭ মি.). এ দেবালয়ের প্রবেশপথের উপরে উৎকীর্ণ দুই পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"শ্রী শ্রীরাম: শুভমস্তু / সকাব্দা ১৬০১।" ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন মন্দিরটির যে চার বার সংস্কার করা হয়েছে তার প্রমাণ চারটি সংস্কারলিপি। সেগুলির পাঠ—(১) "শ্রীসকাব্দ ১৭৬১ / অন্দর মেরামতির / মিস্ত্রি শ্রীরাম-মোহন / সাকিন থলে-রসপুর।" (২) "সকাব্দা ১৮৩৬/গুইরাম সূত্রধর/ সাং ঝাঁংরা।" (৩) "শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা / সন ১৩১৭ সাল।" (এখানে মিস্ত্রীর বদলে সংস্কারকের নামোল্লেখ করা হয়েছে)। (৪) "বিভূতিভূষণ ঘোষ দ্বারা / থলিয়ার মিস্ত্রি ১৩৬৮ / জীবন সূত্রধর।" এ মন্দিরের আদি শিল্পীদের নাম ও নিবাস না জানা গেলেও অসংকোচে বলা যায়, তাঁরা পোড়ামাটির সজ্জা-প্রকরণে সুদক্ষ ছিলেন। কেননা, এতগুলি সংস্কারের (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা সাদা বা রঙিন চুনকামে পর্যবসিত হয়ে 'টেরাকোটা'-অলংকরণের সমূহ ক্ষতি করে) পরও মূর্তি ও নকাশি-ফলকগুলির সজীবতা ও সৌন্দর্য বিস্ময়কর। সংস্কারলিপিগুলি থেকে 'টেরাকোটা'-শিল্পীদের নিবাসের তথ্যও মূল্যবান্। প্রসঙ্গত:, আমতা থানার থলে (থলিয়া), রসপুর এবং ঝিংরা (ঝিখিরা) হাওড়া জেলারই বিভিন্ন গ্রাম। ('রসপুর' ও 'ঝিখিরা' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

মাকড়দহ : হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে হাওড়া-মুন্সীরহাট-ডোমজুড় পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) পাশে, ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মাকড়দহ গ্রাম (জে. এল. নং ৩৪)। দেবী মাকড়চণ্ডী ও তাঁর ভৈরবের মন্দির দুটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। কিংবদন্তী, বর্তমান মন্দির-স্থলের পাশ দিয়ে একদা সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। শ্রীমন্ত সদাগর সে নদীপথে বাণিজ্যযাত্রার কালে একবার নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানকার বেতবনে অধিষ্ঠিতা দেবীর মন্দির নির্মাণ করে তাঁর পূজা দিয়ে যান। এখনও মন্দির-চত্বরে যে তিনটি পাথরের খণ্ড পড়ে থাকতে দেখা যায়, সেগুলি নাকি আদি মন্দিরের অংশবিশেষ। পরবর্তীকালে, মাহিয়াড়ির জমিদার রামকান্ত কুণ্ডুচৌধুরী বর্তমান মন্দির, শিবমন্দির, নাটমণ্ডপ, নওবতখানা ও ভোগগৃহ নির্মাণ করে দেন। দেবীর অলংকরণবিহীন,

অলিন্দযুক্ত, আটচালা মন্দিরের সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ লিপিফলকের পাঠ—"শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমাতাঠাকুরানী শরণং শুভ ৩১শে আষাঢ় সন ১২২৮ সাল ১৭৪৩ শকাব্দ মহীরাড়ী নিবাসী শ্রীরামকান্ত / কুণ্ডচৌধুরী কর্তৃক / এই মন্দির স্থাপিত হইল। মিস্ত্রী শ্রীরামকানাই দাস।" এ দেবালয়ের সাম্প্রতিক সংস্কারকালে নিবদ্ধ আর একটি আধুনিক লিপিতে বলা হয়েছে—"এই পুরাতন মন্দিরটি সম্পূর্ণ সংস্কার করা হইল। বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট (কলিকাতা) কর্তৃক—১৩৭৫।" দেবীর মূর্তি সিন্দুরলিপ্ত একটি শিলাখণ্ড। দৈর্ঘ্যে ২৫'৩" (৭.৭ মি.), প্রস্থে ২৩'৪" (৭.১ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২.২ মি.), এ মন্দিরের দালানের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ পূব-পশ্চিমে টানা-খিলানসমেত চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। প্রাচীর-বেষ্টিত মন্দির-চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেবীর ভৈরবের পূবমুখী আটচালা মন্দিরটি আকারে এতই ছোট যে তার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

দেবীর 'পঞ্চমদোল' এ জেলার এক বিখ্যাত লোকউৎসব। তখন পক্ষকালব্যাপী যে মেলা বসে তাতে প্রচুর জনসমাগম হয়। দোল-পূর্ণিমার পরবর্তী চতুর্থী তিথিতে 'চাঁচর'-এর পঞ্চমীতে 'অন্নকূট'-এর সময় ভীড় হয় সর্বাধিক। 'চাঁচর'-এর দিন গভীর রাত্রে অসংখ্য বাজি পোড়ানোর প্রথাটি খুবই জনপ্রিয়।

মাজুক্ষেত্র : 'ভাণ্ডারগাছা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাঁচা রাস্তায় সে পল্লীর ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) দক্ষিণ-পূবে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মাজুক্ষেত্র গ্রাম (জে. এল. নং ৭৭)। এখানকার দ্বাদশমন্দিরতলায় একত্রে পূবমুখী ছটি এবং পশ্চিম-মুখী ছটি, মোট বারোটি, একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। স্থানীয় চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরগুলি একই মাপের—দৈর্ঘ্যে ৮'৬" (২.৫ মি.), প্রস্থে ৮'২" (২.৪ মি) ও উচ্চতায় আনুমানিক ১৫' (৪.৬ মি.) এবং প্রত্যেকটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। কোন মন্দিরেই লিপিফলক নেই। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রবীনদের মতে এবং স্থাপত্যের নিরিখে, এগুলি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

গ্রামের ধলেপাড়ায় ধলে পরিবারের বুড়োশিবের দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুবার সংস্কারের ফলে, এটির সম্মুখভাগের পোড়ামাটির সজ্জাগুলি বহুলাংশে

বিনষ্ট হয়েছে। যে কটি এখনও অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যে কিছু ফুলকারি নকশা, পদ্ম, এক 'শালভঞ্জিকা' এবং লাঠি-হাতে এক মহন্তমূর্তির কারিগরি মুনশীয়ানা উচ্চশ্রেণীর। দৈর্ঘ্যে ১৬' (৪.৯ মি.), প্রস্থে ১৪'৪' (৪.৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ পুব-পশ্চিমে পাশ-খিলানসমেত চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। গ্রামবৃদ্ধদের মতে, মন্দিরটি ১১৩৩ বঙ্গাব্দে (১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিরিখেও এটির প্রতিষ্ঠাকাল আঠারো শতকের প্রথম ভাগে বলেই মনে হয়।

গ্রামের কুম্ভকারপাড়ায় প্রায় ৬' (১.৮ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর আর একটি দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়। চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়টির বর্তমানে খুবই জীর্ণ দশা। গর্ভগৃহে রক্ষিত স্থানচ্যুত প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"সন ১২১৫।" ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮'৯" (২.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৮' (৫.৫ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

মাড়ঘুরালি : 'দক্ষিণ মাজু' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩.২ কি.মি.) পুবে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মাড়ঘুরালি গ্রাম (জে. এল. নং ৪১)। স্থানীয় মণ্ডলপাড়ায় মণ্ডল পরিবারের গৃহদেবতা দামোদরজীউর আট-কোণা ক্ষুদ্র রাসমঞ্চটি এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। এটির আট-কোণে দু সারি পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে নীচের সারির ২' ৪" (৭১ সে.মি.) উচ্চতার বন্দুকধারী সাহেবমূর্তিগুলি কারিগরি মুনশীয়ানায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরের সারিতে নিবদ্ধ ১' ১০" (৫৬ সে.মি.) উচ্চতার আটটি ফলকের বিষয়বস্তু—গণেশজননী মহন্ত, তবল্য-বাদিকা, ধনুর্বাণধারী রাম, সালংকারা নারী, কৃষ্ণ, পূজারিণী ও নৃত্যরত শিব। ভাস্কর্যের নিরিখে, রাসমঞ্চটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। কিন্তু বেশ বড় মাপের নিরেট 'টেরাকোটা'-মূর্তিশোভিত (যে জাতীয় পোড়ামাটির অলংকরণ এ জেলায় বেশী নেই) এ পুরাকীর্তিটি বর্তমানে ধ্বংসের মুখে।

গ্রামের মহাকালতলায় মহাকাল শিবের একটি দক্ষিণমুখী, এক-দুয়ারী, আটচালা মন্দির আছে। দৈর্ঘ্যে ১১' ৯" (৩.৬ মি.), প্রস্থে ১১' ২" (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ কুঞ্জপৃষ্ঠ খিলান দিয়ে তৈরী গম্বুজের উপর স্থাপিত। স্থাপত্য-

বিচারে, মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত মনে হয়। এ মন্দিরের গর্ভগৃহে রক্ষিত সবুজ পাথরের ('ক্লোরাইট') একটি বিষ্ণুমূর্তি অভিনিবেশযোগ্য। উচ্চতায় ১' ৬" (৪৬ সে.মি.) এবং প্রস্থে ৯" (২৩ সে.মি.), এ ভাস্কর্যের গঠনশৈলীর বিচারে মনে হয়, সেটি খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের শিল্পকর্ম।

মানকুর : 'কুলিয়া' নিবন্ধে মানকুরে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাগনান থানার অন্তর্গত এ গ্রামটি (জে. এল. নং ৩) একদা খুবই বর্ধিষ্ণু ছিল। প্রাচীন সপ্তগ্রামের জমিদার রামেশ্বর রায়কে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব পাঞ্জাপাট্টাখিলাতসহ বারোটি পরগনার যে জমিদারী স্বত্ব দান করেছিলেন, তাদের মধ্যে মানকুর একটি। অম্বিকাচরণ গুপ্ত তাঁর 'হুগলী অথবা দক্ষিণ রাঢ়' পুস্তকে এ পরগনার স্থাননির্দেশ করেছেন—হাওড়া জেলার রূপনারায়ণতীরবর্তী স্থান, যার প্রধান কেন্দ্র ছিল এই গ্রাম। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের কবি কৃষ্ণকিংকর তাঁর 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে আত্মপরিচয়দানকালে মানকুর পরগনার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, মানকুরকে কেন্দ্র করে রূপনারায়ণ নদের দু পাশে, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু গ্রাম এ পরগনার অন্তর্গত ছিল। মনে হয়, নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে মানকুর পরগনা উত্তরকালে ভিন্নভাবে চিহ্নিত হয়েছে। সাবেক পল্লীর পশ্চিমাংশের প্রায় ১ মাইল (১.৬ কি.মি.) স্থান রূপনারায়ণ নদের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বর্ষার জোয়ারের সময় নদীর পাড়ে ভাঙ্গনের ফলে মাটির ৬' (১.৮ মি.) থেকে ৮' (২.৪ মি.) গভীরে বহু ধূসর বর্ণের 'টেরাকোটা'-মৃৎপাত্র, প্রদীপ, বাসনকোসন, মাল্যদানা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি এখান থেকে উচ্চতায় ২' ৮" (৮১ সে.মি.) ও প্রস্থে ১' ৩" (৩৮ সে.মি.) কষ্টিপাথরের যে চামুণ্ডামূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে, তার গঠনশৈলী দেখে মনে হয়, সেটি খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকে নির্মিত। বর্তমানে এটি পাণিত্রাসের 'শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগার'-এ রক্ষিত আছে। 'সপ্তমাতৃকার থান' নামে পরিচিত স্থানীয় এক পূজাস্থানে শুধু সিন্দূরলিপ্ত কয়েকটি প্রস্তর-খণ্ড ছাড়া সপ্তমাতৃকার কোন মূর্তি-ভাস্কর্য নেই। এই উপাসনাস্থল থেকে ধারণা হয়, অতীতের মানকুর হয়ত শক্তিসাধনার এক কেন্দ্র ছিল।

মানসিংপুর : হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে হাওড়া-মুনশীরহাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বড়গাছিয়া-ধর্মতলায় নেমে, কাঁচা

রাস্তায় ১½ মাইল (২.৪ কি. মি.) দক্ষিণ-পুবে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম মানসিংপুর (জে. এল. নং ৫০)। কিংবদন্তী, ওড়িশা অভিযানের সময় মোগল-সেনাপতি মানসিংহ এই অঞ্চলের গৌরীগঙ্গা নদীর পাশে ছাউনি ফেলেছিলেন বলে গ্রামের নাম হয় মানসিংপুর। স্থানীয় তিনটি দেবালয়ের মধ্যে পণ্ডিতপাড়ায় অবস্থিত ধর্মঠাকুরের মন্দিরটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমমুখী এই আটচালা মন্দিরের প্রবেশপথের সম্মুখে চারচালা ধরনের সামান্য উদ্‌গত অংশ যোগ করে সেটির স্থাপত্যে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। সামনের দেওয়ালের উপরিভাগে চুনবালির পলস্তারায় উৎকীর্ণ চার পঙ্‌ক্তির যে লিপিফলক ছিল তার নীচের অংশ ক্ষয়ে গেলেও, "শ্রীশ্রীধর্মঠাকুর / সকাবদা ১৭৩৪······" থেকে প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়ে এখন কোন পোড়ামাটির অলংকরণ না থাকলেও মনে হয় আগে ছিল। কারণ, গর্ভগৃহে রক্ষিত দুর্গা ও রামের দুটি পোড়ামাটির ফলক থেকে এ ধারণাই স্বাভাবিক যে, সংস্কারের সময় সেগুলি হয়ত স্থানচ্যুত হয়েছে। রথের মত এক সুদৃশ্য কাঠের সিংহাসনে ধর্মঠাকুর অধিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যে ১৩′ ১০″ (৪.৩ মি.), প্রস্থে ১৩′ ৮″ (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

অন্য দুটি মন্দিরের মধ্যে রাধাকান্তজীউর পুবমুখী, একদুয়ারী, প্রতিষ্ঠা-লিপিহীন আটচালা দেবালয়টি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যে ৯′ ৩″ (২.৮মি.), প্রস্থে ৯′ ১′ (২.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.), এ দেবগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে লহরাবিন্যাস করে তার উপরে স্থাপিত গম্বুজ দিয়ে তৈরি। একই স্থাপত্যরীতির রঘুনাথজীউর পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি ৫′ (১.৫ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ ৮″ (৩.৬ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৫′ (৭.৬ মি.)। সামনের দেওয়ালে কিছু পঙ্খের অলংকরণ ছাড়াও যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে তার পাঠ—"শ্রীশ্রী৺র / ঘু নাথ জি / উর মন্দির / সন ১৩১৮ সাল।" স্থানীয় ধারণা, লিপিফলকটি সংস্কারের এবং মন্দিরটি প্রাচীন। স্থাপত্যবিচারে, এটিও উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

মানিকুরা—'পেঁড়ো' নিবন্ধে যেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পেঁড়োর পাশে মাদারিয়া খালের পুব তীরের বাঁধ ধরে ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) উত্তরে, আমতা থানার অন্তর্গত মানিকুরা গ্রাম

(জে. এল. নং ১৭৭)। স্থানীয় স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নরমাধব শিবের পূবমুখী, আটচালা শিবমন্দিরটি এখানকার উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। এটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য—সামনের অলিন্দ ত্রিখিলান নয়, মাঝখানের প্রবেশপথের ছু পাশে ছুটি জানালা বসানো। কিংবদন্তী, রেশম ব্যবসায়ে বিত্তবান, কল্যাণচক গ্রামের দ্বারী পরিবারের মদনমোহন দ্বারী মানিকুরা গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্ম এক পুষ্করিণী খননের সময় শিবের এই স্বয়ম্ভু প্রস্তরমূর্তিটি দেখতে পান এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেখানেই বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দেন। এখনও দ্বারী পরিবারের নৈবেদ্য নিবেদিত হবার পরে এ শিবের গাজন-উৎসব শুরু হতে পারে। মন্দিরটিতে কোন লিপি নেই কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার নিজ গ্রামে স্থাপিত তাঁর অন্যান্য মন্দির ও দুর্গাদালানের লিপিফলকের নজিরে, দেবালয়টি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে, প্রবেশপথের ছু পাশে খাড়াভাবে দু সারি ও উপরে অনুভূমিকভাবে এক সারি কুলঙ্গির মধ্যে উৎকীর্ণ পোড়া-মাটির ফলকের বিষয়বস্তু—দশাবতার, কৃষ্ণ, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, বৃষবাহন শিব, মহন্ত, ছুটি মিথুন-ফলক এবং কয়েকটি পদ্ম। সম্প্রতি নীল ও হলুদ রং দিয়ে চুনকাম করায় 'টেরাকোটা'-অলংকরণগুলির খুবই সৌন্দর্যহানি হয়েছে।

মন্দিরটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্যও অভিনিবেশযোগ্য। সামনের দালানের ছাদ টানা-খিলান দিয়ে তৈরী কিন্তু গর্ভগৃহের ছাদ নির্মাণে ছু পাশের দেওয়াল থেকে ৩′ (৯২ সে. মি.) পরিমিত স্থান বাদ দিয়ে, আড়াআড়িভাবে ছু ধারে ছুটি খিলান তৈরি করে, চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ছু পাশে খিলান ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে টানা-খিলানের বদলে লহরার উপর ছাদ স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৮′ ৪″ (৫.৬ মি.), প্রস্থে ১৭′ (৫.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২.২ মি.)।

মাহিয়াড়ি 'আন্দুল' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্দুলের সংলগ্ন উত্তরে, ডোমজুড় থানার অন্তর্গত গ্রাম মাহিয়াড়ি (জে. এল. নং. ২৮)। পাশাপাশি বলে এ ছুটি পল্লী স্থানীয় কথা ভাষায় 'আন্দুল-মৌরী' নামে পরিচিত। এখানকার কুণ্ডচৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন্দ এবং শ্মশানেশ্বর শিবমন্দির ছুটি আয়তনে বৃহৎ না হলেও শতাধিক বৎসরের প্রাচীন হওয়াতে পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে 'সিমাকোর টেলিগ্রাফ'-এর জন্ম নির্মিত

এখানকার মিনারটিকেও এক অভিনব পুরাকীর্তি বলা চলে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে মাহিয়াড়ির এ স্তম্ভটির বর্ণনায় বলা হয়েছে—১৬৫' (৫০.৩ মি.) উচ্চতার এই মিনারের চূড়ায় যেতে হলে পরপর কতকগুলি দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে শুরু করে, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার এবং বিহারের কিছু অংশে এ রকম স্তম্ভ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ'পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায়, এগুলি পরিত্যক্ত হয়। হাওড়া জেলার বড়গাছিয়াতেও এ রকম আর একটি স্তম্ভ একদা নির্মিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তার কোন চিহ্ন নেই। এই ধরনের 'সিমাফোর' স্তম্ভের একটি আলোকচিত্র বর্তমান পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'তে মুদ্রিত হয়েছে।

মুগকল্যাণ : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সাহড়ায় নেমে এখানে যেতে হয়। বাগনান থানার অন্তর্গত এ গ্রামের (জে. এল. নং ৮৯) সিংয়েরডাঙ্গায় অবস্থিত একটি আটকোণা, আটচালা শিব-মন্দির স্থানীয় অভিনব পুরাকীর্তি। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন, পরিত্যক্ত এ দেবালয়ে চারকোণা চালের পরিবর্তে দুটি আটকোণা চালা বর্তমান। গর্ভগৃহের ছাদ আটকোণা দেওয়ালের কোণে কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের আটটি খাড়া দেওয়ালের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৪' ৬" (১.৩ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ২০' (৬.১ মি.)। প্রবেশপথের উপরে আগে একটি লিপিফলক ছিল, কিন্তু এখন নেই। গঠনশৈলীর নিরিখে এটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। এহেন স্থাপত্যরীতির দেবালয় শুধু হাওড়া জেলায় কেন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই বিরল।

মেল্লক : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের দেউলটি স্টেশনে নেমে, পিচের উত্তরমুখী শরৎচন্দ্র রোড ধরে (সাইকেল-রিক্শ পাওয়া যায়) ১ মাইল (১.৬ কি. মি.) দূরে বাগনান থানার মেল্লক গ্রামে (জে. এল. নং ২০) পৌঁছনো যায়। মণ্ডলঘাট পরগনার সুপ্রসিদ্ধ ভূস্বামী মুকুন্দপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালজীউর (কৃষ্ণরাধিকা) দক্ষিণমুখী, অলিন্দযুক্ত, আটচালা মন্দিরটি এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রধান প্রবেশ-পথের উপরিভাগে যে লিপিফলকটি উৎকীর্ণ ছিল তার পাঠ—"সুবম / স্ত সকা / ব্দাঃ / ১৫৭৩।" ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি শুধু

হাওড়া জেলার সর্বপ্রাচীন দেবালয়ই নয়, আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম আটচালা মন্দিরগুলির অন্যতম। সামনের ভিত্তিবেদীর উপর পাথরের এক যুক্তকর গরুড়মূর্তি ওড়িশা-রীতির স্মারক। ত্রিখিলান প্রধান প্রবেশপথের উপরে, মধ্যস্থলে, রাম কর্তৃক মারীচবধের 'টেরাকোটা'-অলংকরণ, বাঁ দিকে লক্ষ্মীসরস্বতী ও ডান দিকে শুধু রামলক্ষ্মণের মূর্তি এবং অবশিষ্ট স্থানে ইতস্ততঃ নিবদ্ধ কয়েকটি ছোটবড় পদ্মফুলের ফলক দেখা যায়। বাঁকানো কার্নিসের নীচে অনুভূমিক এক সারি পোড়ামাটির ফলকে পৌরাণিক দেবদেবী ও দশাবতার রূপায়িত। কার্নিস এবং এই ফলকগুলির মাঝামাঝি শূন্যস্থান পূরণের জন্ত প্রায় ১' (৩০.৫ সে. মি.) ব্যাসের পোড়ামাটির বন্ধনীযুক্ত অনেকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্ম পর পর নিবদ্ধ। মন্দির-পাদমূলে ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক সারিবদ্ধ কোন, অলংকরণ নেই কিন্তু থামগুলি 'টেরাকোটা'- সজ্জাশোভিত। বিষয়—কৃষ্ণলীলা, বিবিধ ভঙ্গিতে মহস্ত, বেদেনীদের কসরৎ প্রভৃতি। স্তম্ভের উপরিভাগে ত্রিভঙ্গ-কৃষ্ণ এবং আরও উপরে সূক্ষ্ম নকাশি লতা। দালানের ভিতরের দেওয়ালে পদ্ম ও নকাশি লতা এবং পুব দিকের অতিরিক্ত দরজাটির উপরে সুন্দর কয়েকটি লম্ফমান সিংহ দেখা যায়। সাবেক মন্দিরে 'টেরাকোটা'-সজ্জার পরিমাণ যে আরও অনেক বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রায় ৫' (১.৫ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৈর্ঘ্যে ৩৪'৫" (১০.৫ মি.), প্রস্থে ২৮'৩" (৮.৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৫' (১৩.৭ মি.), এ মন্দিরের সামনের এবং পুব দিকের দালানের ও গর্ভগৃহের পশ্চিমের ছোট কুঠরির ছাদ টানা-খিলান দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রধান প্রবেশপথের পাথরের চৌকাঠের গায়ে খোদাই-কাজ দেখে মনে হয় সেটি কোন প্রাচীন মন্দিরে ব্যবহৃত দ্বারপার্শ্ব। দক্ষিণের দালানে কষ্টিপাথরে নির্মিত পালযুগের কিছু ক্ষয়িত ও ভগ্ন বাসুদেবমূর্তিটির উচ্চতা এবং প্রস্থ আনুমানিক ৩½' × ১¾' (১.১ মি. × ৫৪ সে. মি.)।

গভীর পরিতাপের বিষয়, ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক বহু বিলম্বে মন্দিরটি সংস্কারের সময় সামনের অংশ ভেঙে পড়ে। পরবর্তী কালে এটিকে সংস্কারযোগ্য করা হলেও এর পূর্বতন সৌকর্য বহুলপরিমাণে নষ্ট হয়েছে।

যদুপুর: 'ইছাপুর' নিবন্ধে পাতিহালে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাতিহালের প্রায় সংলগ্ন পশ্চিমে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত

মন্থুপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৮)। ধর্মরাজঠাকুরের প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন, পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি এখানকার একমাত্র দ্রষ্টব্য। গর্ভগৃহে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯" (২৩ সে.মি.) মাপের এক চৌকা কষ্টিপাথরের ফলকে পদ্মাকৃতি ভাস্কর্যের মধ্যে পিঠে বিষ্ণুপদচিহ্ন অঙ্কিত কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির পদ্মফুল ছাড়া প্রবেশপথের দু ধারে শঙ্খবাদনরত দুটি মহন্তমূর্তি এবং তাদের উপরে নকাশি অলংকরণ দেখা যায়। ৪'৭" (১.৪ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দৈর্ঘ্যে ১৭'১০" (৫.৪ মি.), প্রস্থে ১৫'৭" (৪.৮ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০.৭ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ উত্তর-দক্ষিণে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। দক্ষিণ দিকেও আর একটি প্রবেশপথ আছে। স্থাপত্যশৈলীর বিচারে, মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষ ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

বস্থুরবেড়িয়া : 'উলুবেড়িয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে পাকা রাস্তায় ১½ মাইল (২.৪ কি.মি.) উত্তরে উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বস্থুরবেড়িয়া (কথ্য ভাষায় 'বস্থুরবেড়ে') গ্রাম (জে. এল. নং ৮৮)। স্থানীয় বসু পরিবারের পুষ্করিণী খনন-কালে প্রাপ্ত চৌকা আকারের ও বিভিন্ন মাপের ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ড এখানকার উল্লেখ্য পুরাবস্তু। দু একটি প্রস্তরমূর্তিও নাকি পাওয়া গিয়েছিল ; কিন্তু বর্তমানে সেগুলির হদিস কেউ জানে না। পাথরের খণ্ডগুলি কোন বৃহৎ মূর্তির পাদপীঠ বা মন্দিরের নিম্নাংশ বলে মনে হয়। সেজন্য এরূপ অনুমান হয়ত সঙ্গত যে, খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকে এখানে (বা কাছাকাছি স্থানে) একটি পাথরের মন্দির ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হলে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগৃহীত হবার সম্ভাবনা আছে।

বাদববাটি : 'দক্ষিণ মাজু' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ মাজুর সংলগ্ন উত্তরে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বাদববাটি গ্রাম (জে. এল. নং ৩৫)। স্থানীয় দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন ও অনুল্লেখযোগ্য আটচালা মন্দির ছাড়াও বিন্দুবাসিনী দেবীর প্রতিষ্ঠিত একতলা দালানের উপর পশ্চিমমুখী নবরত্ন মন্দিরটির গড়ন লক্ষণীয়। শেষোক্ত মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ শিবলিঙ্গ, কিন্তু পিছনের দেওয়ালে এক বড় কুলুঙ্গিতে অন্নপূর্ণা ও ভিখারী শিবের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য এখানকার প্রধান পার্বণ শিবরাত্রি ও অন্নপূর্ণা পূজা। মন্দিরটির একতলার ঢাকা বারান্দার উপর খোলা ছাদ চুনবালির

পলস্তারা-আবৃত ইটের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সে রেলিং-এর উপর কিছু দূর অন্তর, চুনবালির পলস্তারায় নির্মিত পরী, প্রহরী, সিপাহী প্রভৃতির বড় বড় মূর্তি বসানো আছে। খোলা আকাশের নীচে অনাবৃত থাকায় বর্তমানে সেগুলি অল্পবিস্তর জীর্ণ। গর্ভগৃহের ঠিক উপরের দ্বিতল কক্ষটির পুবের দেওয়ালে ছাড়া অন্য তিন দিকের দেওয়ালে পঙ্খ ও চুনবালির উপাদানে গঠিত নকাশি অলংকরণ এবং বিভিন্ন দেবদেবীমূর্তির কারিগরি দক্ষতা উচ্চ শ্রেণীর। ঢাকা বারান্দাসমেত মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৮′ ৬″ (৮.৬ মি.), প্রস্থে ২০′ ৯″ (৬.৩ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০.৭ মি.)। শ্বেতপাথরের লিপিফলক থেকে জানা যায়, শ্রীনাথচন্দ্র সরকারের কন্যা এবং শ্রীধরচন্দ্র রক্ষিতের বিধবা স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী ১৩১৩ বঙ্গাব্দের (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ) ১৩ই বৈশাখ এ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন না হলেও, চুনবালি ও পঙ্খের কাজের উৎকৃষ্ট নিদর্শনের জন্য এ মন্দিরটি অভিনিবেশযোগ্য।

রণমহল : 'ইছাপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইছাপুরের সংলগ্ন পুবে, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ও রণমহল-ভূরশুট মৌজাভুক্ত গ্রাম রণমহল (জে. এল. নং ৪৩)। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন, পুবমুখী, একদুয়ারী আটচালা শিবমন্দিরটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। অলংকরণহীন এ দেবালয়টি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ ৩″ (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.)। সেটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও চড়ক উপলক্ষে এখানে মেলা বসে।

রতনপুর : 'গণেশপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ১½ মাইল (২.৪ কি.মি.) উত্তরে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত রতনপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৩৩)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি—প্রতিষ্ঠালিপিহীন, দক্ষিণমুখী এক দালান-মন্দির যেখানে 'রতনমালা' নামে পরিচিতা দেবী বিশালাক্ষীর মৃন্ময়মূর্তি উপাসিত। দেবীর নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হওয়া থেকে দেবীর প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। দু পাশে দুই ব্যাঘ্রসহ শায়িত ভৈরব মহাকালের উপর দণ্ডায়মানা, দ্বিভূজা, নৃমুণ্ডমালিনী দেবীর ডান হাতে খড়্গ ও বাঁ হাতে সুধাভাণ্ড। এ মন্দির থেকে প্রতিদিন ভোরে এবং সন্ধ্যায় দামামা বাজিয়ে যে সংকেতধ্বনি করা হয়, সে সম্বন্ধে কিংবদন্তী—একদা শ্রীমন্ত সদাগর দেবালয়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দামোদরে ডিঙা

ভাসিয়ে বাণিজ্যযাত্রার সময় ভক্তিভরে দেবীদর্শন করেন ও প্রতিদিন এখানে দামামা বাজাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। শিবের গাজনের মত চৈত্রসংক্রান্তিতে দেবীর গাজন হয় এবং সেই উপলক্ষে 'ঝাঁপপাড়া' অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর্ধমানের মহারাজা দেবীর পূজার্চনার ব্যয় নির্বাহের জন্ত নাকি দেড় শ বিঘার মত জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছিলেন।

তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও, 'রত্নমালা' মন্দিরের পাশে একটি প্রতিষ্ঠালিপিহীন, পুবমুখী, একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির দেখা যায় যেটি, স্থানীয় সংবাদ অনুসারে, প্রায় ৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যে ১৫' (৪.৬ মি.), প্রস্থে ১২'৬" (৩.৮ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

রসপুর : 'অমরাগড়ি' নিবন্ধে আমতায় পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দামোদরের পুব তীর বরাবর বাঁধের কাঁচা রাস্তায় ২½ মাইল (৪ কি.মি.) উত্তরে আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রাম (জে.এল.নং ১৫৩)। গ্রামের পূর্বপাড়ায় বুড়ো শিবের আমলকবৃক্ত, পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী একটি আটচালা মন্দির এখানকার দ্রষ্টব্য পুরাকীর্তি। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণ না থাকলেও বাঁকানো কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ লিপিফলকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ রসপুর বা পাশের গ্রাম থলিয়া একদা মন্দির-স্থপতিদের প্রখ্যাত কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত ময়াল গ্রাম থেকে আগত কারিগর এ মন্দির নির্মাণ করেছেন। দুই পঙ্‌ক্তির আলোচ্য লিপিফলকের পাঠ—"শ্রী৺চন্দ্রচূড় ঠাকুর শ্রীজাদবচন্দ্র রায় সাং রসপুর / শ্রীবোনমালী দাস মিস্তিরি সাং ময়াল সন ১২৭৭ সাল।" ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয় দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি.)। গর্ভগৃহের ছাদ কুব্জপৃষ্ঠ খিলান দিয়ে তৈরি গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

গ্রামের গড়চণ্ডীতলায় এক দালান-মন্দিরে গড়চণ্ডীর মূর্তিটি অভি-নিবেশযোগ্য। দেবী এখানে দুর্গারূপে উপাসিতা। তাঁর দু পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মূর্তিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত। এ সব বিগ্রহ নিমকাঠে তৈরী অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন, যা থলিয়া অঞ্চলের 'সূত্রধর'-শিল্পীদের কাঠখোদাই-কাজে অতি উচ্চ নৈপুণ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ মন্দিরে রক্ষিত কষ্টিপাথরের একটি সুন্দর

মনসামূর্তি পুরাবস্তু হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দামোদরের চড়া থেকে প্রাপ্ত সেন আমলের এ মূর্তিটি উচ্চতায় ৯½" (২৪ সে.মি.) এবং প্রস্থে ৫" (১২.৮ সে.মি.)। এত প্রাচীন পাথরের মনসামূর্তি একান্ত বিরল। এ ছাড়া একটি বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশও এ মন্দিরে রক্ষিত আছে।

খ্রীষ্টীয় সতরো শতকের 'শিবায়ন' কাব্যরচয়িতা কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে রসপুরে রাধাকান্ত বিগ্রহ (কৃষ্ণ ও রাধিকামূর্তি) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্মিত সেই প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হলে বিগ্রহ একটি দালান-মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। রাধাকান্তজীউর অলৌকিক কাহিনী সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী প্রসঙ্গে শ্রীপাঁচুগোপাল রায় তাঁর 'রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রসপুর রায়বংশের ইতিকথা' গ্রন্থে বলেছেন—কবি রামকৃষ্ণ এ বিগ্রহকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করতেন এবং প্রখর গ্রীষ্মে বিগ্রহের অঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ত। এ সব অলৌকিক কাহিনী শুনে তৎকালীন বর্ধমানরাজ তাঁর লোকলস্করসমেত রসপুরে এসে বলপূর্বক বিগ্রহ দুটিকে নিয়ে যান। রাধাকান্তবিরহে কাতর কবি রামকৃষ্ণ তারপর অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করেন। এ সংবাদ শুনে বর্ধমানরাজ নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার ব্যবস্থা করে দেন এবং দেব-সেবার জন্য কিছু ভূসম্পত্তিও দান করেন।

রাউতাড়া : 'ঝিখিরা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝিখিরার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত আমতা থানার এলাকাধীন গ্রাম রাউতাড়া (জে. এল. নং ৬৮)। এখানকার কয়েকটি দেবালয়ের মধ্যে ঘোষপাড়ায় ঘোষ পরিবারের সীতারামজীউর দক্ষিণমুখী, অলিন্দ-যুক্ত আটচালা মন্দিরটি এক উৎকৃষ্ট পুরাকীর্তি। ত্রিখিলান প্রবেশ-পথের উপরের তিনটি অংশেই লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য উৎকীর্ণ। সামনের দেওয়ালের একেবারে নীচে, ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক দু সারি সামাজিক চিত্রফলকের বিষয়বস্তু—অশ্বারোহী, উট-আরোহী, বর্শাধারী অশ্বারোহী শিকারী, সহিসসমেত যুদ্ধসাজে সজ্জিত ঘোড়া, সেকালের পালকি ('সুখাসন')-বাহিত বাবু, পাত্রমিত্রপরিবৃত ধনী ভূস্বামীর নৌকাভ্রমণ, ফরসিসেবনরত বাবু ইত্যাদি। এর উপরের সারিতে ও স্তম্ভগাত্রে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, বাদকবাদিকা, মহন্ত ও বিবিধ পৌরাণিক দেব-দেবীমূর্তি। কার্নিসের অনুভূমিক, কুলঙ্গিমধ্যস্থ, দু সারি মূর্তি-ভাস্কর্যের বিষয়বস্তুও অনুরূপ। বাঁ দিকের পূর্ণস্তম্ভে উৎকীর্ণ লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশসমেত একটি অপূর্ব দুর্গামূর্তির কারিগরি অসামান্য।

মন্দিরটির 'টেরাকোটা'-সজ্জা খুব উচ্চাঙ্গের হলেও সংস্কারের সাধু উদ্দেশ্যে অনিষ্টকর চুনকাম করায় অনুপম কারুকৃতিগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বস্তুতঃ, হাওড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'টেরাকোটা'-মন্দিরের এহেন ইচ্ছাকৃত সৌন্দর্যহানি গভীর পরিতাপের বিষয়। মাঝখানের খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ—"শুভমস্তু সকাব্দা ১৬২২··· মার্গ ১৬ দিনে শ্রীগোপাল কর্মি গঠীত।" ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয় দৈর্ঘ্যে ১৯'১" (৫.৮ মি.), প্রস্থে ১৬' ২" (৪.৯ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০.৭ মি)। অলিন্দের ছাদ দু পাশে দুটি কুম্ভপৃষ্ঠ-খিলান এবং মধ্যস্থলে টানা-খিলানের উপর রক্ষিত। গর্ভগৃহের ছাদ পুব-পশ্চিমের পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

গ্রামের সরকারপাড়ায় ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রায় পরিবারের দামোদরজীউর (শালগ্রাম) দক্ষিণমুখী আর একটি অলিন্দযুক্ত আটচালা দেবালয় আছে। এখানেও ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য এবং ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক সারিতে সামাজিক দৃশ্যের নানা ফলক উৎকীর্ণ হলেও কারিগরিতে সেগুলি অপেক্ষাকৃত হীন। স্তম্ভের গায়ে, দু পাশের দেওয়ালে দু সারি করে এবং বাঁকানো চালের অনুভূমিক দু সারিতে কুলুঙ্গি-ভাস্কর্যে পৌরাণিক দেবদেবী, দশাবতার ইত্যাদি প্রদর্শিত। মধ্য-খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ লিপির পাঠ—"শ্রীরাম শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৮৪ সন ১১৬৯ শ্রীশুকদেব·········।" ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ দেবালয়ের দালানের ছাদ টানা-খিলানের উপর এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭' ৪" (৫.৩ মি.), প্রস্থে ১৬' ৩" (৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০.৭ মি.)।

আমতা-ঝিখিড়া সড়কের সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত মানিক পীরের পুবমুখী দোচালা-রীতির একটি দরগা আকারে ছোট হলেও গুরুত্বে বড়। স্থানীয় রায় পরিবার প্রতিষ্ঠিত এ দরগার প্রবেশপথের উপরে প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে—"মানিক পীর ভরসা/সন ১২০৪ সালে তপস্বী বাঞ্ছারাম রায়ের স্বনামধন্য পুত্র স্বর্গীয় রামজয় রায় স্থাপিত দরগা/তদীয় বংশধরগণ কর্তৃক সংস্কার হইল। সন/১৩৫৬ সাল, ২রা বৈশাখ।" এক মুসলমান পীরের স্মৃতিরক্ষার্থে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কর্তৃক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্চর্য পুরাকীর্তিটি পৌনে দু শ বছরের বেশী সময় ধরে স্থানীয় হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক স্থায়ী

মিলনসেতুরূপে বিরাজ করছে। কাছাকাছি বহু গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নরনারী মানিক পীরকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, তাঁর কাছে মানত করেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে মানসিকের পুজো দিয়ে যান। পীরের বাৎসরিক উৎসব হয় ২রা বৈশাখ। তখন বেশ বড় মেলা বসে, মানিক পীরের গান হয়, দূরদূরান্তর থেকে হিন্দু-মুসলমান ভক্তরা এসে উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্য এই পীরকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।

রাণাপাড়া: 'আমতা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমতা থেকে দামোদরের পূর্বতীরবর্তী বাঁধের কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ মাইল (৩.২ কি.মি.) দক্ষিণে আমতা থানার অন্তর্গত রাণাপাড়া গ্রাম (জে. এল. নং ১৪১)। স্থানীয় ধাওয়া পরিবারের ফকিরদাস ধাওয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী আটচালা শিবমন্দিরটি এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। অলংকরণবিহীন এই দেবালয়ে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নাই। কিন্তু পারিবারিক শ্রুতি অনুসারে, এটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। স্থাপত্যরীতিতেও সে কথার সমর্থন মেলে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১২' (৩.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৪' (৭.৩ মি.), এ মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ কুব্জপৃষ্ঠ-খিলাননির্ভর গম্বুজ দিয়ে তৈরি। একই পরিবারের বাস্তুভিটার চত্বরে নারায়ণ ও জোড়া শিবের তিনটি পুবমুখী, একদুয়ারী, ছোট আটচালা মন্দির বর্তমান শতকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলির দেওয়ালে পঙ্খের অলংকরণ প্রশংসনীয়।

রাধাপুর: হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান রেল-স্টেশন থেকে বাগনান-কমলপুর পিচের সড়কের প্রায় শেষ প্রান্তে (এ পথে নিয়মিত বাস চলে) শ্যামপুর থানার অন্তর্গত রাধাপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৮৯)। স্থানীয় সামন্ত পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। সেটিতে 'টেরাকোটা'-সজ্জার অভাব পূরণ করেছে খোদাই-কাজের অপূর্ব অলংকরণযুক্ত প্রবেশপথের দুটি কাঠের কপাট। প্রতি কপাটে চারটি সমান্তরাল সারির অর্ধেক অংশে নকাশি অলংকরণবেষ্টিত বর্গাকার স্থানে 'বা রিলিফ' পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ হয়েছে বিবিধ পৌরাণিক দেবদেবী-মূর্তি এবং কৃষ্ণলীলার দৃশ্য। বস্তুতঃ, হাওড়া জেলায় এহেন অলংকৃত মন্দিরদ্বার এবং নিরেট কাঠের বিগ্রহ সংখ্যায়, হুগলী ছাড়া, অন্য যে কোন জেলার থেকে বেশীই হবে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে আনুমানিক ১৪' (৪.৩ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা

নির্মিত। কোন লিপিফলক না থাকলেও স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মন্দিরটি আঠারো শতকের বলে মনে হয়।

রাধাপুর গ্রামের পশ্চিমে রূপনারায়ণতীরবর্তী চড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত কয়েকটি পুরাবস্তুর মধ্যে রোমান শিরস্ত্রাণ-ধারী, দ্বিমুখবিশিষ্ট, হাতলযুক্ত এক পোড়ামাটির মূর্তি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে প্রাচীন রোমান যুদ্ধদেবতা 'জানুস'-এর সঙ্গে সেটির সাদৃশ্য আছে। মূর্তিটি বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত।

রামপুর (উদয়নারায়ণপুর থানা): 'আমতা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমতার সংলগ্ন পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৩)। এখানকার গোস্বামীপাড়ায় স্থানীয় গোস্বামী পরিবারের গৃহদেবতা বৃন্দাবনজীউর অলিন্দযুক্ত, দক্ষিণমুখী, আটচালা মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারের প্রবীণদের মতে, এটির সাবেক 'টেরা-কোটা'-অলংকরণ নষ্ট হওয়ায় তার পরিবর্তে বর্তমান পঙ্খের ফুলকারি নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে। সামনের কার্নিসের নীচে এক পঙ্‌ক্তির প্রতিষ্ঠা-লিপির পাঠ—"শক ১৭০৩ সন ১১৮৮।" ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরের একাধিকবার সংস্কার হয়েছে বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যে ১৫'৯" (৪.৮ মি.), প্রস্থে ১৪'৬" (৪.৪ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০.৭ মি), এ দেবালয়ের অলিন্দের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ পুব-পশ্চিমে পাশ-খিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরা-নির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় ত্রিলোকরাম চক্রবর্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চক্রবর্তী পরিবারের গৃহদেবতা রসিকরায়জীউর আর একটি দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী আটচালা মন্দির আছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১'৬" (৩.৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারের মতে, এই অলংকরণ ও প্রতিষ্ঠালিপিহীন মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত।

রামপুর (জগৎবল্লভপুর থানা) —'নাইকুলি' নিবন্ধে মুনশীরহাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি.মি.) পুবে, জগৎবল্লভপুর থানার রমানাথবাটি মৌজার (জে. এল. নং ২১) অন্তর্ভুক্ত রামপুর গ্রাম। শিলাখণ্ডরূপী ধর্মরাজ

এবং লিঙ্গরূপী বুড়োশিবের দুটি মন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। পণ্ডিতপাড়ায় ধর্মরাজের অলিন্দহীন, আটচালা মন্দিরটি দক্ষিণমুখী হলেও পুব দিকে আর একটি দরজা আছে। প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত পরিবারের মতে, লিপিবিহীন এ দেবালয়টি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৬″ (৩.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬.১ মি.), এ মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

চক্রবর্তীপাড়ায় স্বয়ম্ভূ বুড়োশিবের অলিন্দহীন, পশ্চিমমুখী, আটচালা মন্দিরটি সম্ভবতঃ ধর্মমন্দিরের থেকে প্রাচীন। ৬′ (১.৮ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়ে কোন লিপিফলক না থাকলেও স্থাপত্যের নিরিখে এটিকে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। স্থানীয় ভূস্বামী ৺মহেশ পাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটিতে চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উৎসবের সময় চড়ক ও বঁটিঝাঁপ প্রভৃতি হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ ৬″ (৩.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭.৬ মি.), এ দেবগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। সম্প্রতি চুনকাম করে মন্দিরটির সংস্কার করা হয়েছে।

রামেশ্বরপুর : হাওড়া-মুনশীরহাট-আমতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মুনশীরহাটে নেমে, কাঁচা রাস্তায় ১ মাইল (১.৬ কি.মি.) পুবে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত রামনাথবাটি মৌজাভুক্ত রামেশ্বরপুর গ্রাম (জে.এল.নং ২২)। স্থানীয় মিত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি পশ্চিম-মুখী, অলিন্দহীন, আটচালা শিবমন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। 'টেরাকোটা'-অলংকৃত এ দেবালয়ের প্রবেশপথের উপরে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য, দু পাশের খাড়া সারি ও কার্নিসের নীচের অনুভূমিক সারিতে কুলঙ্গির মধ্যে দশাবতার ও নানান পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি-ভাস্কর্য নিবদ্ধ। লিপিফলকটির পাঠ—"শুভমস্তু সকাব্দা ১১৫৩।" ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ১৩′ (৪ মি.), প্রস্থে ১২′৪″ (৩.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.২ মি.), এ মন্দিরটি সম্পর্কে পারিবারিক শ্রুতি এই যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় শিবলিঙ্গ অপহৃত হওয়ায় মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়। সংরক্ষণের অভাবে মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রায়।

গ্রামের চক্রবর্তীপাড়ায় অবহেলায় জীর্ণ পশ্চিমমুখী, একদুয়ারী এক

আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়। সামনের দেওয়ালে পঙ্খের পলস্তারার উপর ক্ষোদিত এক লিপিফলকের পাঠ—"সখবদা/সোন ১২৩৯।" অর্থাৎ, মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯'৬" (২.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫' (৪.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ কুব্জপৃষ্ঠ খিলান দিয়ে তৈরি গম্বুজের উপর স্থাপিত। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরটি লুপ্ত হতে চলেছে।

স্থানীয় রায়পাড়ায় পশ্চিমমুখী আরও একটি একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির জঙ্গলাচ্ছাদিত অবস্থায় বর্তমান। এটির ছাদও কুব্জপৃষ্ঠখিলান দিয়ে তৈরি গম্বুজের উপর স্থাপিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০' ৬" (৩.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ মন্দিরে কোন লিপিফলক না থাকলেও এটি যে চক্রবর্তীদের মন্দিরের সমসাময়িক তাতে সন্দেহ নেই।

শাঁকরাইল : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের শাঁকরাইল স্টেশনে নেমে পিচের সড়কে ১ মাইল (১.৬ কি.মি.) পুবে অথবা হাওড়া-শাঁকরাইল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) এখানে (জে. এল. নং ২০) পৌঁছনো যায়। কিংবদন্তী, শ্রীচৈতন্যদেবের পুরী যাত্রাকালে এখানকার অধিবাসীরা শঙ্খরোল তুলে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন বলে, অপভ্রংশে গ্রামের নাম হয়েছে শাঁকরাইল। সরস্বতী ও ভাগীরথীর সংযোগস্থলে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামটির অবস্থান যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে সম্পর্কে অমিয়কুমার ব্যানার্জি সম্পাদিত হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (কলকাতা : ১৯৭২) বলা হয়েছে—১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লু. সাউটেন, ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগস্ট তারিখের ডাইরীতে জোব চার্ণক এবং ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন গোল্ডসবরো 'শাঁ ক্রোল' নামে পল্লীটির উল্লেখ করেছেন। রেণেলের মানচিত্রেও এ স্থানের নাম পাওয়া যায়।

দেবী বিশালাক্ষীর একটি ছোট আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। প্রচলিত জনশ্রুতি, স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এক পূর্বপুরুষকে দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়ে নিকটের বিশালাক্ষী দহ থেকে আবির্ভূতা হন এবং পরে হেস্টিংসের সমসাময়িক শাঁকরাইলের জমিদার রাজা মদন রায় দেবীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। এ দেবালয়ে কোন অলংকরণ বা প্রতিষ্ঠালিপি নেই। উল্লিখিত জনশ্রুতি সত্য হলে, এটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষভাগে নির্মিত বলে মনে করা যায়।

শিবগঞ্জ : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশনে নেমে বাগনান-শিবগঞ্জ পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শ্যামপুর থানার অন্তর্গত শিবগঞ্জ গ্রামে (জে. এল. নং ১০৮) পৌঁছনো যায়। তিন গম্বুজবিশিষ্ট, পুবমুখী এক প্রাচীন মসজিদ এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। কিংবদন্তী, বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কাশেম খাঁ নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সূত্রে এ স্থানের নাম হয় কাশিমনগর। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দুর্ভিক্ষ ও প্রবল বন্যায় স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরা অন্যত্র চলে গেলে গ্রামটি পরিত্যক্ত হয়। পরে, এ অঞ্চল নারিট-গাজীপুরের জমিদার শিব রায়ের জমিদারির অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এবং এখানে তাঁরই পত্তন করা নতুন গঞ্জ থেকে গ্রামের নাম হয় শিবগঞ্জ। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের এ মসজিদটির ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত তিনটি গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যে ৫৩′ (১৬.১ মি.), প্রস্থে ২৩′ (৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫′ (৪.৬ মি.), এ পুরাকীর্তিটির রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন খুবই জীর্ণ দশা।

শ্রীকোল : 'মুনেবাড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুনেবাড়ের সংলগ্ন উত্তরে শ্যামপুর থানার অন্তর্গত শ্রীকোল গ্রাম (জে. এল. নং ৭০)। স্থানীয় বনমালী শিবমন্দিরের পশ্চিম পাশে অবস্থিত একটি উঁচু ঢিপি এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। ঢিপিটির সর্বত্রই ইটের টুকরো ছড়ানো এবং গ্রামবৃদ্ধদের বিশ্বাস সেটি এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন বাঞ্ছনীয়।

স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বনমালী শিবের মন্দিরটি ছোট, প্রতিষ্ঠালিপিহীন এবং সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে নির্মিত। এ শিব সম্পর্কে জনশ্রুতি, বর্গীর হাঙ্গামার সময় এ মন্দির লুণ্ঠিত হয় এবং সেই থেকে শিবলিঙ্গের শীর্ষে অস্ত্রাঘাতের দাগ দেখা যায় যেজন্য তিনি 'কাটাশিব' নামেই এ অঞ্চলে বেশী পরিচিত।

সাতমহল : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের কুলেশ্বর স্টেশনের পার্শ্ববর্তী উলুবেড়িয়া থানার কুলেশ্বর মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ১০৮) উত্তর দিকের পল্লীটি সাতমহল নামে পরিচিত। একদা স্থানীয় এক পুষ্করিণী খননের সময় কালো পাথরের দুটি দ্বারপার্শ্ব পাওয়া যায়। ২′৪″ (৭১ সে. মি.) দীর্ঘ, ১′৪″ (৪১ সে. মি.) প্রস্থ ও ৯″ (২৩ সে. মি.) পুরু প্রথমটির গায়ে নক্সাশি অলংকরণ এবং ২′৪″ (৭১ সে. মি.) দীর্ঘ, ১′৫″ (৪৩ সে. মি.) প্রস্থ ও ৭″ (১৮ সে. মি.) পুরু দ্বিতীয়টির

গায়ে ক্ষরিত একটি ত্রিমুখ মূর্তি ও নৃত্যরত একটি ছোট মূর্তি দেখা যায়। এ পুরাবস্তু দুটি খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের হওয়া সম্ভব। এগুলি হয়ত কাছাকাছি কোন প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশপথের অংশ। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন, পুষ্করিণী খননকালে ইটের এক চওড়া দেওয়ালও নাকি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য উৎখনন বাঞ্ছনীয়।

সামতাবেড়িয়া : 'মেল্লক' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে মৌজার উত্তর অংশে অবস্থিত পল্লী সামতাবেড়িয়া, যা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীনিবাসের সুবাদে সকলের কাছে 'সামতাবেড়' নামে পরিচিত। এখানকার শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে রক্ষিত সবুজ 'ক্লোরাইট' পাথরের একটি বাসুদেবমূর্তি এক উল্লেখ্য পুরাবস্তু। মূর্তিটি একদা রূপনারায়ণ নদতীরবর্তী চড়াতে পাওয়া যায়। চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডে ত্রিমাত্রিকভাবে ক্ষোদিত চতুর্ভুজ মূর্তিটির ভাস্কর্য-শৈলীতে ওড়িশা-রীতির প্রভাব দেখা যায়। সম্ভবত: এটি খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের কোন পাথরের মন্দিরের অংশ ছিল।

সাহড়া : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) পাশে, বাগনান থানার অন্তর্গত সাহড়া গ্রাম। একটি দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। প্রতিষ্ঠালিপি ও অলংকরণহীন এ দেবালয়ের প্রবেশপথের সম্মুখে চারচালা ধরনের সামান্য অংশ উদ্গত করে মন্দিরটির গঠনসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবার চেষ্টা হয়েছে। চূড়ায় ওড়িশা-রীতির অনুরূপ এক আমলকও দেখা যায়। বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত এ মন্দিরটি ৫' (১.৫ মি.) উচ্চতার এক ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। স্থাপত্যবিচারে, এটি খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

সিংটি : 'আসণ্ডা' নিবন্ধে উদয়নারায়ণপুরে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দক্ষিণমুখী পিচের সড়কে ২½ মাইল (৪ কি. মি.) দূরে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত সিংটি গ্রাম। অল্পবিস্তর 'টেরাকোটা'-অলংকরণযুক্ত তিনটি মন্দির এখানকার উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। বেরাপাড়ায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বেরা পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দনজীউর দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটির প্রবেশ-পথের উপরে পোড়ামাটির ফলকে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য এবং

প্রতিষ্ঠালিপি উৎকীর্ণ। লিপিটির পাঠ—"শুভমস্ত সকাব্দ ১৬৯৯ সাল ১১৮৪·········বলরাম বেরা।"

করপাড়ার কর পরিবারের অলিন্দবিহীন, দক্ষিণমুখী, লক্ষ্মীনারায়ণের আটচালা মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে লঙ্কাযুদ্ধের পোড়ামাটির অলংকরণ এখন খুবই ক্ষয়িত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দেবালয়টি পূর্ব-বর্ণিত মন্দিরের সমকালীন বলেই মনে হয়।

সামন্তপাড়ায় দেবী শীতলার পুবমুখী, অলিন্দহীন, আটচালা মন্দিরটিকে অলংকরণের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। এ দেবালয়ের প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির ফলকে প্রথম সারিতে রূপায়িত হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য, মাঝের সারিতে নানান সামাজিক দৃশ্য এবং নীচের সারিতে মহিষাসুর বধের দৃশ্য। লিপিফলকহীন এ মন্দিরটিও খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

সিদ্ধেশ্বর : হাওড়া-রাণীহাটি-আমতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গাববেড়িয়া থেকে কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) উত্তরে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বর গ্রাম (জে. এল. নং ৬৪)। স্থানীয় হাটতলায় স্বয়ম্ভূ বুড়োশিবের পুবমুখী, অলিন্দহীন, আটচালা মন্দিরটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০′ (৬. ১ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০. ৭ মি.), অলংকরণবিহীন এ মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ কুব্জপৃষ্ঠ খিলান দিয়ে তৈরী গম্বুজের উপর স্থাপিত। গঠনস্থাপত্যের নিরিখে, লিপিফলকহীন এ দেবালয়টি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। এ অঞ্চলে জনপ্রিয় বুড়োশিবের গাজন-উৎসব বেশ জাঁকজমক সহকারেই হয়ে থাকে।

সীতাপুর : 'আসণ্ডা' নিবন্ধে উদয়নারায়ণপুরে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ মাইল (৩২ কি.মি.) উত্তর-পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত সীতাপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৯)। একদা রেশম ব্যবসায়ে বিত্তবান এই গ্রামের সামন্ত পরিবারের শ্রীধরনাথজীউর (শালগ্রাম) পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। তাঁর মূল মন্দিরটি কালক্রমে ধ্বংস হওয়ায় বিগ্রহ বর্তমানে এই রাসমঞ্চে অধিষ্ঠিত। সাবেক রাসমঞ্চটির চারিদিক ফাঁকা ছিল, কিন্তু দেবপ্রতিষ্ঠাকালে তিন দিকে দেওয়াল তুলে এটিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই অভিনব রাসমঞ্চের প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা'-অলংকরণের বিষয়বস্তু লঙ্কাযুদ্ধ। প্রবেশপথের দু পাশে এবং কার্নিসের সমান্তরাল, কুলঙ্গিমধ্যস্থ মূর্তি-

ভাস্কর্যে রূপায়িত হয়েছে —দশাবতার, বিভিন্ন ভঙ্গিতে কৃষ্ণ, কয়েকটি মহন্ত, ধনুর্বাণধারী শিকারী, মৃদঙ্গবাদক, ব্রহ্মা, নর্তকী প্রভৃতি। প্রবেশ-পথের ডান দিকে, ভিত্তিভূমির উপরে, অনুভূমিক সারিতে প্রথাগত সামাজিক দৃশ্য, যথা —হরিণশিকারী, বন্দুকধারী শিকারী, হস্তীপৃষ্ঠে শিকারী ও একটি মিথুন-ভাস্কর্য এবং তার উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন ফলক দেখা যায়। বাঁ দিকে, অনুরূপভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে নর্তকী, মিথুনদৃশ্য ও 'বাবু'র পদসেবারত নারী প্রভৃতি। এই ছোট রাসমঞ্চটির গায়ে এত অলংকরণ দেখে সন্দেহ থাকে না যে, অধুনালুপ্ত, সমকালীন মূল মন্দিরটিতে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী 'টেরাকোটা'-সজ্জা ছিল। পারিবারিক শ্রুতি ও অলংকরণশৈলীর নিরিখে, প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন রাসমঞ্চটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮' (২.৪ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১২' (৩·৭ মি.), এ রাস-মঞ্চের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে এই সুন্দর পুরাকীর্তিটির অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে চলেছে।

সুলতানপুর : হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-শ্যামপুর-কমলপুর পিচের সড়কের (নিয়মিত বাস চলে) পাশে, বেলপুকুর হাটের ½ মাইল (০.৮ কি. মি.) পুবে, শ্যামপুর থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রাম (জে. এল. নং ৭৩)। স্থানীয় মল্লিকপাড়ায় খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত একটি চারচালা মন্দির এখানকার বিশিষ্ট পুরাকীর্তি। মন্দিরটির বিগ্রহ স্বয়ম্ভূ 'খটিয়াল শিব'। অলিন্দহীন এ দেবালয়ের প্রধান প্রবেশপথ পশ্চিমে কিন্তু দক্ষিণেও আর একটি ছোট দরজা আছে। সামনের দেওয়ালে, খিলানশীর্ষে, পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে ইতস্তত:-বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ধরনের প্রস্ফুটিত ফুল ও পদ্মের অন্তর্বর্তী স্থানে রাম কর্তৃক মারীচবধের দৃশ্য। তার ডান পাশে বৃক্ষশাখাধারী হনুমান এবং বাঁ পাশে সর্পভোজনরত এক ময়ূরের ফলক দেখা যায়। প্রবেশখিলানটি অতি সুন্দর ফুলকারি নকশা ও প্রাচীন রীতির লম্ফমান সিংহমূর্তি দিয়ে বেষ্টিত। সাবেক মন্দিরে খুব সম্ভব আরও অলংকরণ ছিল যা সংস্কারের সময় হয়ত অপসৃত হয়েছে। এ মন্দিরে অন্যূন পাঁচটি লিপিফলকের সমাবেশও কৌতূহলোদ্দীপক। সামনের বাঁকানো কার্নিসের নীচে পাশাপাশি দুটি দুই পঙ্‌ক্তির পোড়ামাটির ফলকের পাঠ (বাঁ দিকে)—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ শুভমস্তু/বকাব্দা : ১৫৮৮ সক" এবং (ডান দিকে) : "পিতা শ্রীগৌরদাস

দত্ত/কন্যা শ্রীমতি মাধবি দাসি।" ডান দিকের দেওয়ালে পাঁচ পঙ্ক্তির লিপিফলকটির বয়ান—"শ্রীশ্রীরামচিতা/চরণ বরজে শ্রী/শিবরাম দা/স দাসস্য/সন ১০৭২ সা··· ।" এ লিপির নীচে ছয় পঙ্ক্তির আর একটি লিপি নিম্নরূপ—"শ্রীশ্রীরামসীতা/মথুরাদাস দাস/তস্য সুত শ্রীকালি/কা প্রসাদ দাস/তস্য সুত শ্রীদু/র্গা দাস দাস।" এ ফলকের নীচে আরও যে একটি ফলক আছে, তা সংস্কারসূচক হলেও দেড়-শতাধিক বৎসরের প্রাচীন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। লিপিটির পাঠ—"শ্রী শ্রীশিবম্বর/মেরামতি সন/১২২৭ সাল/শ্রীকমলাকান্ত স/রকার শ্রীরামতনু ·····।" মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' ৪" (৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯.২ মি.), এ দেবালয়, উল্লিখিত প্রথম প্রতিষ্ঠালিপি অনুযায়ী, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হওয়ার দরুণ মেল্লকের ('মেল্লক' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) মন্দিরটি (১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) ছাড়া হাওড়া জেলার প্রাচীনতম দেবগৃহ। এটির চারচালা গড়নও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা অনুরূপ স্থাপত্যের পুরাকীর্তি এ জেলায় আর নেই বললেই চলে।

সেকরাহাটি : 'নাইকুলি' নিবন্ধে মুনশীরহাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানকার বাস-স্টপেজের সংলগ্ন দক্ষিণে জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত সেকরাহাটি গ্রাম (জে. এল. নং ২১)। স্থানীয় ঘোষপাড়ায় ঘোষ পরিবারের শতাধিক বৎসরের পুরাতন একটি পশ্চিমমুখী, অলিন্দহীন আটচালা মন্দির ও রাসমঞ্চ এখানকার উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। বাস্তুদেবতা শ্রীধরজীউ (শালগ্রাম) এবং শিব এ দেবালয়ের প্রধান দেবতা। পোড়ামাটির অলংকরণহীন এ মন্দিরের মর্মর-প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"বাস্তুমন্দির / দেবোত্তর শ্রীশ্রী৺শ্রীধরজীউ দিং / প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দাতারাম ঘোষ / পুত্র / সেবাইত ৺শম্ভুচরণ ঘোষ / পুত্র / সেবাইত ৺ভগবান চন্দ্র ঘোষ / পুত্র / সেবাইত ৺অঘোর চন্দ্র ঘোষ / পুত্র / সেবাইত ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ / সাং সেকরাহাটি, হাওড়া।" বারো পঙ্ক্তির দীর্ঘ উৎসর্গলিপিতে নির্মাণকালের অনুল্লেখ এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯' (২.৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬.১ মি.), এ দেবালয়ের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। মন্দিরের উত্তর পাশে যে রাসমঞ্চটি আছে, তার আকার চারিদিক খোলা আটচালা মন্দিরের মত এবং সেটির ছাদও একইভাবে গঠিত। রাসমঞ্চটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮' ৬" (২.৫ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০' (৬.১ মি.)। এটির সামনের খিলানশীর্ষে চুন-

বালির পলস্তারায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠ—"প্রতিষ্ঠাতা দাতারাম ঘোষ / বাস্তুমন্দির দেবত্তর / সেকরাহাটি।"

সোনাতলা: 'গড়ভবানীপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গড়ভবানীপুরের সংলগ্ন পশ্চিমের গ্রাম উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত সোনাতলা (জে. এল. নং ৫২)। এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি দক্ষিণমুখী, অলিন্দহীন একটি আটচালা শিবমন্দির। মন্দিরটি চুনবালির পলস্তারা-আবৃত; তাতে কোনরকম অলংকরণ নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' ৯" (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭.৬ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। কোন লিপিফলক না থাকলেও এটি যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

হরালী: 'সীতাপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সীতাপুর থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ মাইল (৩.২ কি.মি) পশ্চিমে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত হরালী গ্রাম (জে. এল. নং ৫)। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি স্থানীয় মাইতি পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর (শালগ্রাম) একটি দক্ষিণমুখী, অলিন্দহীন আটচালা মন্দির। ৪' (১.২ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে যেসব পোড়ামাটির অলংকরণ আছে, তার বিষয়-বস্তু—দশাবতার, লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য, বানর সেনার সেতুবন্ধন, বিভিন্ন কর্মরত মহন্ত প্রভৃতি। প্রবেশপথের দু ধারে পঙ্খের ভাস্কর্যে রূপায়িত দুই নারীমূর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' ৬" (৪.১ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৬' (৭.৯ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। সামনের কার্নিসের নীচে চুনবালির পলস্তারায় উৎকীর্ণ দুই পঙ্‌ক্তির সংস্কারলিপিটির পাঠ—"শ্রীশ্রী৺শ্রীধরজীউ। সন ১৩৩৭ বৈশাখ / ৺সহস্ররাম মাইতি দিগর স্থাপিত রিপিয়ার দ্বারা শ্রীআশুনাথ মাইতি।" এক্ষেত্রে নির্মাণকাল উল্লিখিত না হওয়ায় পারিবারিক সংবাদে প্রকাশ, প্রতিষ্ঠাতা সহস্ররাম মাইতি প্রায় ১৮০ বছর আগে জীবিত ছিলেন। 'টেরাকোটা'-শৈলীর নিরিখেও মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের প্রথমে নির্মিত বলে মনে হয়।

গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় বুড়োশিবের দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী আটচালা শিবমন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ৺গৌরী মণ্ডল। কিংবদন্তী, বর্গীর হাঙ্গামার সময় তিনি নাকি লুণ্ঠিত ধনরত্নের ভুলক্রমে ফেলে-যাওয়া একটি বস্তা

পেয়ে আঠারো শতকের শেষ নাগাদ এ দেবালয় নির্মাণ করান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'৩" (৩.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫' (৪.৬ মি.), এ মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত।

অদূরের দেবী বিশালাক্ষীর দালান-মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হলেও লৌকিক দেবী হিসাবে তাঁর এ অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধি আছে।

হরিনারায়ণপুর : 'মুগকল্যাণ' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হরিনারায়ণপুর বাগনান থানার মুগকল্যাণ মৌজার (জে. এল. নং ৮৯) দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রাম। প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে এই পল্লী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক বৎসর পূর্বে নবাসনের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'র পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে এখানে বেশ কিছু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়। গ্রামটির মাঝখানের 'দমদমা' (স্থানীয় কথ্য ভাষায় মাটির উঁচু ঢিপিকে 'দমদমা' বলে) ও তার আশপাশ থেকে বিভিন্ন কালের কয়েকটি কষ্টিপাথরের বাসুদেবমূর্তি পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের (আনুমানিক) ৩½'(১.১ মি.) ও ২½' (৭৬ সে.মি.) উচ্চতার দুটি মূর্তি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী কলাভবনে সংরক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া আনুমানিক দশ-এগারো শতকের তিনটি ছোট বাসুদেবমূর্তির (এগুলি 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত) ভাস্কর্য একান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। চতুষ্কোণ ফলকের উপর অগভীরভাবে ক্ষোদিত এবং তীক্ষ্ণ গভীর রেখায় সৃষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অলংকার ও পরিধেয় বস্ত্রের ভাঁজ প্রভৃতির সমন্বয়ে ভাস্কর্যগুলির মধ্যে এক আদিম ভাব প্রতিফলিত। মনে হয়, এসব পুরাবস্তু স্থানীয় কোন প্রাচীন বিষ্ণু-মন্দিরের অংশ। এইসঙ্গে প্রাপ্ত আনুমানিক এগারো-বারো শতকের ৫" (১৩ সে.মি.) উচ্চতার একটি পাথরের মহিষমর্দিনীমূর্তি বিশেষ অভি-নিবেশযোগ্য। চতুষ্কোণ প্রস্তরফলকে স্বল্প গভীরভাবে উৎকীর্ণ এ মূর্তিটির নিম্নাংশ ভগ্ন হলেও দেবীর রণভঙ্গিমা লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্যে প্রোজ্জ্বল। এ পুরাবস্তুটিও বর্তমানে 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত। আদিম বঙ্গাক্ষরের নমুনাযুক্ত কয়েকটি পোড়ামাটির সীল-মোহরের ফলকও এই প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। (অনুরূপ ফলক মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও পান্না এবং হাওড়া জেলার বাছরীতেও পাওয়া গিয়েছে)। প্রত্নলিপিতত্ত্বের দিক থেকে, এগুলিকে খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের বলে অনুমান করা যেতে পারে।

গ্রামের বিভিন্ন স্থানে মাটি খোঁড়বার সময় পোড়ামাটির পাটের বেড় দেওয়া অনেকগুলি কুয়াও আবিষ্কৃত হয়। খুব ছোট আকারের 'টেরাকোটা'-নারীমূর্তিকা, নানান ধরনের পুতুল, ধূসর রঙের হাতি, কমদামী জহরত ও পোড়ামাটির বেশ কিছু মালাদানা এখানে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর অন্তর্গত। আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রগুলি অতি প্রাচীনতার লক্ষণযুক্ত এবং আকৃতি ও প্রলেপরীতি দেখে মনে হয়, সেগুলি পাল-সেন যুগের পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। নবাশ্মর যুগের কালচে-সবুজ রঙের একটিমাত্র তিনকোণা আয়ুধও উল্লেখযোগ্য।

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত পুরাবস্তুসমূহের নিরিখে বোঝা যায়, প্রাচীন কোন জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখানকার ভূগর্ভে প্রোথিত আছে, যার বিশদ পরিচয় বৈজ্ঞানিক উৎখননের সাহায্যে উন্মোচিত হতে পারে।

হরিশপুর : 'পেঁড়ো' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পেঁড়ো থেকে মাদারিয়া খালের পশ্চিম তীরের বাঁধ ধরে কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) দক্ষিণে উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত পেঁড়ো-হরিশপুর মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ১৬৬) হরিশপুর গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের সামুইপাড়ায় সামুই পরিবারের বাস্তুশিবের পূবমুখী একটি পঞ্চরত্ন শিখর-দেউল এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ পরিবারের প্রবীণদের মতে, সামুইরা একদা মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগণায় রেশমের ব্যবসায়ে বিত্তবান হওয়ায় সেখান থেকে কারিগর এনে এ দেবালয় নির্মাণ করান। স্থাপত্য ও পোড়ামাটির সজ্জায় মন্দিরটি মেদিনীপুর জেলার সমকালীন বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ দেউলের বরণ্ড থেকে মস্তক অবধি আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা এবং শীর্ষে একটি বৃহদাকার আমলক। প্রবেশপথের উপরিভাগে চার সারি পোড়ামাটির ফলকে বৃন্দাবনে জগন্নাথ এই পরিবর্তন-সহ দশাবতার, বৃষবাহন শিব, ঢোল করতাল ও শিঙাবাদক, ময়ূর এবং টিয়াপাখি প্রভৃতির মূর্তি উৎকীর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ভিত্তিভূমি ও বরণ্ডের মাঝখানে কুলঙ্গিমধ্যে ৩' ৩" (৯৯ সে মি.) উচ্চতার পোড়া-মাটির দুটি দ্বারপালমূর্তি দেখা যায়। প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ এক পঙ্ক্তির প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ—"শ্রী শ্রীসিবঠাকুর স্ুভমস্তু সকাব্দা ১৭৬৩ সন ১২৪৮ পরিচারক শ্রীগোউর সামুই।" ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত এবং এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৬' ৬" (১. ৯ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ১৫' (৪.৬ মি.)।

হাওড়া শহর : হাওড়া পৌর এলাকায় অবস্থিত হলেও থানা মাকুয়া, বেতড় ও ভোটবাগান তাদের স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য পৃথক নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এ শহরের অবশিষ্ট অংশে অল্পসংখ্যক পুরাকীর্তি বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শহরের মধ্যস্থলে, বাঁটরা থানার অন্তর্গত পঞ্চাননতলায়, পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য না হলেও লৌকিক দেবতা হিসাবে তিনি খুবই জনপ্রিয়। অশ্বারূঢ়, ত্রিনয়ন, জটাজুটধারী পঞ্চানন্দের মাটির মূর্তিটির ডান হাতে ত্রিশূল ও বাঁ হাত অভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে প্রসারিত। পদতলে, জোড়হস্তে উপাসনারত বাহন পাঁচুঠাকুর। মূল বিগ্রহের এক পাশে কালী ও শীতলা এবং অন্য পাশে ষষ্ঠী ও মনসা অধিষ্ঠিতা। চৈত্রসংক্রান্তিতে পঞ্চানন্দের চড়ক উপলক্ষে মেলা বসে। অতীতে তাঁর খ্যাতি আরও দূরবিস্তৃত ছিল। কেননা, দ্বিজ রঘুনন্দন এই দেবতার বন্দনায় তাঁর 'পঞ্চাননমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) সে পুঁথির নকল করেন খুরুট গ্রামের জনৈক রামকান্ত পণ্ডিত। এই নিরিখে, পঞ্চানন্দ ঠাকুর শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলেই মনে হয়। (হাওড়া জেলায় পঞ্চানন্দ ঠাকুরের সংখ্যাধিক্য এবং স্থানীয় জনমানসে তাঁর প্রতিপত্তি সম্পর্কে বর্তমান সংকলকের রচিত 'হাওড়া জেলার লোক-উৎসব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চানন্দ-মন্দিরের অনতিদূরে দেউটি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত 'রামেশ্বর' শিবের পূবমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলে মনে হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের রামরাজাতলা ষ্টেশনে নেমে, অথবা হাওড়া-রামরাজাতলা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শহরের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রামরাজাতলায় পৌঁছনো যায়। স্থানীয় রামরাজার বিগ্রহ থেকেই এ এলাকার নাম। প্রায় দু শ বছর আগে এই দেবপূজার প্রবর্তন করেন এখানকার তৎকালীন জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী। প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার দিন রামরাজার মূর্তি নির্মাণের উদ্বোধন হয় এবং রামনবমীর পূর্বেই তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যান্য ছাব্বিশটি বিগ্রহের মধ্যস্থলে। রামনবমীতে শুরু হয় বিরাট এক মেলা যা চৈত্র মাসের শুক্লানবমী থেকে শ্রাবণের শেষ রবিবার বিসর্জনের দিন পর্যন্ত চলে। পাশের সাতঘরা ও বাক্সাড়ায় উপাসিত এবং রামরাজার সমপরিমাণ উচ্চতার নবনারীকুঞ্জরমূর্তি এবং ইছাপুর বারুজীবী সমিতির প্রতিষ্ঠিত সৌমচণ্ডীর অনুরূপ আয়তনের আর একটি মূর্তি ওই একই দিনে বিসর্জিত হয়।

রামরাজাতলা এলাকার চৌধুরীপাড়ায় কাছাকাছি অবস্থিত তিনটি পুবমুখী ও একটি দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী, আটচালা শিবমন্দির আছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং সম্ভবতঃ অন্য মন্দিরগুলির তুলনায় প্রাচীন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ ৬″ (৪. ২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭. ৬ মি.), এ দেবালয়টি, স্থাপত্যের নিরিখে, খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত মনে হয়। একেবারে পুব পাশে অবস্থিত পুবমুখী মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ ৪″ (৩. ৫ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২২′ (৬. ৭ মি.)। পশ্চিম পাশের পুবমুখী মন্দির দুটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ (৩. ৪ মি.) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২০′ (৬. ১ মি.)। চৌধুরীপাড়ায় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের একটি পুবমুখী, একদুয়ারী, আটচালা মন্দিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩. ৭ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬. ১ মি.)। আলোচ্য পাঁচটি মন্দিরই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং তাদের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

হাওড়া রেল-স্টেশন থেকে শিবপুর বা বি. ই. কলেজ বা আঁদুল বা উলুবেড়িয়াগামী বাসে শিবপুর থানার সদর শিবপুরে যাওয়া যায়। আঁদুলের রাজা রামচন্দ্র রায় কর্তৃক মন্দিরতলায় প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী শিবমন্দিরটি এখানকার অন্যতম পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি, এই শিবমন্দির থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয় শিবপুর। সংলগ্ন ভড়পাড়ার চারমন্দিরতলায় এক প্রশস্ত অঙ্গনমধ্যে আঁদুলরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি দুটি পুবমুখী নবরত্ন এবং উত্তর ও দক্ষিণমুখী দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। নবরত্ন মন্দির দুটির সামনের দেওয়ালে একদা উৎকৃষ্ট পঙ্খের কাজ ছিল। কিন্তু সংস্কারের ফলে সেগুলি বর্তমানে শ্রীহীন। প্রায় ৫′ (১.৫ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দির দুটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ ৩″ (৫. ৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৫′ (১৩.৭ মি.)। পঞ্চরত্ন মন্দির দুটির সম্মুখভাগের পঙ্খের অলংকরণ অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক ইতস্ততঃ নিবদ্ধ দেখা যায়। এ মন্দির দুটিও ৫′ (১. ৫ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ ৮″ (৪. ২ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০. ৭ মি.)। আলোচ্য চারটি মন্দিরই একদুয়ারী এবং তাদের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। জনশ্রুতি, একদা এ মন্দির-অঙ্গনটি নাকি ভাগীরথীতীরেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে মন্দিরগুলির খ্যাতি ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়ে। (অদূরে বেতাইচণ্ডীর

মন্দির সম্পর্কে 'বেতড়' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। নিকটবর্তী কাজীপাড়ায় 'বড়া-মসজিদ' নামে পরিচিত পুবমুখী একটি প্রাচীন এক-গম্বুজ মসজিদ এখানকার আর এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি।

হাওড়া পৌর এলাকায় প্রাচীনতম গির্জাটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কুলেন প্লেসে প্রতিষ্ঠা করেন জনৈক ব্যাপটিষ্ট রেসিডেন্ট মিশনারী মিঃ স্ট্যাথাম। পরবর্তীকালে, হাওড়ায় রেল-লাইন স্থাপনের স্থান সংকুলানের জন্ম গির্জাটিকে ডবসনস্ লেন ও কিংস্ লেনের সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত করে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'গথিক'-স্থাপত্য অনুসরণে একটি নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া কলকাতার ধনী পর্তুগীজদের অর্থানুকূল্যে এবং রেভারেণ্ড ফাদার পল ডি প্রাডোলির উদ্যোগে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কুলেন প্লেসে 'আয়োনিক'-শৈলীতে আরও একটি বৃহদায়তন রোমান ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয়। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এখন যেখানে অবস্থিত, পূর্বে সেখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মিশনারীদের শিক্ষণের জন্ম কলকাতার প্রথম বিশপ মিডল্‌টনের উদ্যোগে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপস্ কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসঙ্গতঃ, এই কলেজেরই অধ্যাপক ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিদ্যায়তনের ছাত্র ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে, ওই কলেজের প্রাঙ্গনে সরকার প্রদত্ত পাঁচ বিঘা জমির উপর ইংলণ্ড চার্চের প্রথম গির্জা নির্মিত হয়। ১৩০টি আসনবিশিষ্ট 'গথিক'-স্থাপত্যশৈলীর এই উপাসনালয়ের স্থপতি ছিলেন উইলিয়ম জোন্‌স এবং পরে এই গির্জার নাম হয় সেণ্ট টমাস গির্জা। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, এই খ্রীষ্টধর্মশিক্ষণকেন্দ্রটি কারিগরীশিক্ষার মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়, যা আজকের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে পরিচিত। গির্জার প্রাঙ্গনে বিশপ মিডল্‌টন, হেবার এবং উইলসন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিহত কলেজের চারজন ছাত্রের স্মৃতিফলক এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সমাধি আজও সেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

গ্রন্থপঞ্জী

ও'ম্যালী, এল. এস. এস. এবং চক্রবর্তী, মনোমোহন — বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স—হাওড়া : কলিকাতা, ১৯০৯
কাব্যস্মৃতিতীর্থ, হরিদাস — 'খড়ি-খপ বার্তা' : হাওড়া, ১৩২১
গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দগোপাল — 'হাওড়া জেলার একটি লৌকিক দেবতা', (প্রবন্ধ) : 'কৌশিকী', ৮ম-৯ম সংখ্যা, ১৩৭৯
গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার — বাংলার ভাস্কর্য : কলিকাতা, ১৯৪৭
গুপ্ত, অম্বিকাচরণ — হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় : কলিকাতা, ১৯১৪
ঘোষ, দেবপ্রসাদ — স্টাডিস্ ইন্ মিউজিয়ম অ্যাণ্ড মিউজিওলজি ইন ইণ্ডিয়া : কলিকাতা, ১৯৬৮
ঘোষ, বিনয় — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : কলিকাতা, ১৩৬৩
ঘোষ, যামিনীমোহন — মস্‌ মেজার্স ইন বেঙ্গল : কলিকাতা, ১৯৮০
চক্রবর্তী, মিনতি — 'অকারেন্স অভ্ নিওলিথিক ইমপ্লিমেন্টস্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' (প্রবন্ধ) : 'বুলেটিন অভ্ দি কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ভল্যুম ৬, নং ১, ১৯৬৭
চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ — সংক্ষিপ্ত পল্লীচিত্র : বাগনান, ১৩২০
চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ — শিবপুর কাহিনী : হাওড়া, ১৩২৬
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার — 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি' (প্রবন্ধ) : 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৫
চৌধুরী, শশিভূষণ — এথনিক সেটেলমেন্টস্ ইন এনসিয়েন্ট্ ইণ্ডিয়া : কলিকাতা, ১৯৫৫
দত্ত, অক্ষয়কুমার — ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২য় ভাগ), ১৮৮৩
দত্ত, কালিদাস — 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি' (প্রবন্ধ) : 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', ১৩৪১
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার — বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি (২য় সংস্করণ), ১৩৮২
বাঁকুড়ার মন্দির : কলিকাতা, ১৩৭১
— দেখা হয় নাই : কলিকাতা, ১৩৮০
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র — বালীর ইতিহাসের ভূমিকা : হাওড়া, ১৩৪৩
ব্যানার্জি, অমিয়কুমার — হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : কলিকাতা, ১৯৭২
ব্যানার্জি, চন্দ্রনাথ — অ্যান্ অ্যাকাউন্ট অভ্ হাওড়া, পাস্ট অ্যাণ্ড্ প্রেজেন্ট : কলিকাতা, ১৮৭২
বোনার্জি, জে. — হাওড়া সিভিক কম্প্যানিয়ন, ভল্যুম ১ : ১৯৫৫
ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র — 'ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ' (প্রবন্ধ) : 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৫৯
ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ — হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস

মিত্র, অশোক (সম্পাদিত) — পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (২য় খণ্ড): ১৯৬৮

ম্যাক্‌কাচ্চন, ডেভিড — লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস্ অফ্ বেঙ্গল: ১৯৭২

— 'নোটস্ অন সাম টেম্পলস্ ইন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট' (প্রবন্ধ): সেন্‌সাস্ হ্যাণ্ডবুক-হাওড়া : ১৯৭০

রায়, নীহাররঞ্জন — বাঙালীর ইতিহাস(আদিপর্ব): কলিকাতা, ১৩৫৯

রায়, পাঁচুগোপাল — রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রসপুর রায় বংশের ইতিকথা : আমতা, ১৯৬৪

রায়, বি. (সম্পাদিত) — ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস্ হ্যাণ্ডবুক : হাওড়া-১৯৬১

লাহিড়ী, দুর্গাদাস — বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, দ্বাদশ অধিবেশন : হাওড়া, ১৩২৭

সাঁতরা, তারাপদ — হাওড়া জেলার লোক-উৎসব : হাওড়া, ১৩৬৯

— 'বাংলার মন্দির : মন্দিরগড়া স্থপতিদের ঠিকানা' (প্রবন্ধ) : 'চতুষ্কোণ', ফাল্গুন, ১৩৭৬

— 'মেদিনীপুরের একজন মন্দির স্থপতি : শিল্পনিপুণ জীবন পরিচয়' (প্রবন্ধ): 'চতুষ্কোণ', আশ্বিন, ১৩৭৭

— 'আর এক হরিনারায়ণপুর' (প্রবন্ধ) : 'আনন্দম্' স্মারকগ্রন্থ, ১৩৭১

— 'গ্রামের নাম কি করে হল : শিবেড়া' (প্রবন্ধ) : 'কৌশিকী', ১ম-৫ম সংখ্যা, ১৯৭৪

— 'বাঙালীর সংস্কৃতিসাধনা ও বাংলার সংগ্রহশালা' (প্রবন্ধ): 'পশ্চিমবঙ্গ', ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭২

— 'আর্কিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন অ্যাট দি ভ্যালী অভ্ কানা দামোদর' (প্রবন্ধ) : 'হিউম্যান ইকোলজি', জুন ১৯৬৯

— 'লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস্ অভ্ ওয়েস্ট বেঙ্গল : অ্যান্ অ্যাকাউন্ট্ অভ্ দেয়ার আর্কিটেকচার অ্যাণ্ড্ ডিকোর' (প্রবন্ধ) : 'বাংলাদেশ ললিত-কলা', ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা : ঢাকা, ১৯৭৫

— 'ক্যাটালগিং অ্যাণ্ড ডকুমেন্টেশন্ অভ্ মিডিভ্যাল্ টেম্পলস্ অভ্ বেঙ্গল : অ্যান এ্যানালিসিস্ অভ্ প্রবলেমস্ এ্যাণ্ড মেথড্‌স্' (প্রবন্ধ) : ক্যালকাটা রিভিউ, ১৯৭২

সিংহ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ — দি হিস্ট্রি অভ্ বেঙ্গল(১৭৫৭-১৯০৫): ১৯৬৭

সেন, প্রবোধচন্দ্র — 'সাম্ জনপদস্ অভ্ অ্যানসিয়েন্ট্ রাঢ়' (প্রবন্ধ) : 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', ভল্যুম ৮, ১৯৩২

অনুক্রমণিকা*

*পোড়ামাটির ফলকগুলির নাম পৃষ্ঠা উল্লেখ ক'রে সূচীপত্রে দেখানো হয়েছে বলে অনুক্রমণিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আলোকচিত্র

[পরবর্তী আলোকচিত্রগুলি শ্রীতারাপদ সাঁতরা (১০, ১১ ও ২১ নং), শ্রীশিবেন্দু মান্না (১৫, ১৮, ২২ ও ২৪ নং) এবং অবশিষ্ট ২৭টি শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত ও সেগুলির সর্বস্বত্ব, যথাক্রমে, তাঁদের দ্বারা সংরক্ষিত। এ সমস্ত ছবি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব-পরিকল্পিত 'লে-আউট' অনুসারে, তাঁর নিজস্ব 'ডার্ক-রুমে' পরিস্ফুটিত করে এ পুস্তকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।]